আশুরা: করনীয় ও বর্জনীয়

[বাংলা]

عاشوراء بين الاتباع والابتداع

« اللغة البنغالية »

সংকলন: আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

تأليف: عبد الله شهيد عبدالرحمن

সম্পাদনা: নোমান আবুল বাশার

مراجعة: نعمان بن أبو البشر

2011 - 1432

IslamHouse.com

সূচীপত্র

১-অভিমত
২-দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
৩-আশুরার বৈশিষ্ট্য ও তার সওমের ফজীলত
৪-আশুরার সওমের ইতিবৃত্ত ও তার বিধান
৫-আশুরার সওম পালনে ইহুদীদের বিরোধীতা করার নির্দেশ
৬- কিভাবে পালন করবেন আশুরার সওম
৭-শরীয়তের মানদন্ডে আশুরার প্রচলিত আমলসমূহ
৮- আশুরা সম্পর্কে প্রচলিত ভুল আকীদাহ
৯- কারবালার ঘটনার সাথে আশুরার কি সম্পর্ক ?
১০-কারবালার ঘটনার স্মরণে শোক ও মাতম করা প্রসঙ্গে
১১- আবেগ ও মুহাব্বত যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়
১২-কাফিরদের সৎকর্ম সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
১৩- বর্তমান সময়ের ইহুদী খৃষ্টানরা কী আশুরা পালন করে?
১৪-কাফিরদের আচার-আচরণ অনুসরণ না করা ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক
১৫-নৈকট্য অর্জন ও মুহাব্বতের সত্যিকার পরিচয়
১৬ - সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গ
১৭-আল্লাহ তাআলার ইবাদত সবচেয়ে বড় শুকরিয়া
১৮-আলোচনার সারকথা

আশুরার বৈশিষ্ট ও তার সওমের ফজীলত

দ্বীনে ইসলামে কিছু পর্ব বা দিবস আছে। যেগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করেছেন ইবাদত-বন্দেগী বা নেক আমল করার জন্য। এমনি একটা দিবসের নাম আশুরা। হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের দশ তারিখ। মুসলিম উম্মাহর দ্বারে কড়া নাড়ে প্রতি বছর।

এ মাস আমাদের স্বরণ করিয়ে দেয় আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরত ও তার দাওয়াতী জিন্দেগী শুরু ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা। এ মাসে রয়েছে এমন একটি দিন, দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে যে দিনে নবী মুসা আ. এর বিজয় হয়েছিল। পতন হয়েছিল তখনকার সবচেয়ে শক্তিশালী জালেম সম্রাট ফেরআউন ও তার সম্রাজ্যের। সে দিনটিই হল আশুরা; মুহাররম মাসের দশ তারিখ।

এ দিনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে খুবই প্রিয়। তাই তিনি এ দিনে সওম পালনের সওয়াব প্রদান করে থাকেন বহুগুণে।

যেমন হাদীসে এসেছে

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم

“আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রমজানের পর সর্বোত্তম সওম হল আল্লাহর প্রিয় মুহাররম মাসের সওম। এবং ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাতের সালাত"

বর্ণনায় ঃ মুসলিম

আশুরার বৈশিষ্টের মধ্যে রয়েছে এ দিনে আল্লাহ তায়ালা তার নবী মুছা আ. ও তার অনুসারী ঈমানদারদের ফেরআউনের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরআউনকে তার বাহিনীসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন।

সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনায় আগমন করলেন তিনি আশুরার দিনে ইহুদীদের সওম পালন করতে দেখলেন। যেমন হাদীসে এসেছে

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا اليوم

الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.

رواه البخاري و مسلم

"ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় এসে দেখলেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিনে সওম পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন "এটা কোন দিন যে তোমরা সওম পালন করছ? তারা বললঃ এটা এমন এক মহান দিবস যেদিন আল্লাহ মুছা আ. ও তার সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরআউনকে তার দলবলসহ ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মুছা আ. শুকরিয়া হিসেবে এ দিনে সওম পালন করেছেন। এ কারণে আমরাও সওম পালন করে থাকি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "তোমাদের চেয়ে আমরা মুছা আ. এর অধিকতর ঘনিষ্ট ও নিকটবর্তী।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওম পালন করলেন ও অন্যদেরকে সওম পালনের নির্দেশ দিলেন।

বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম

রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের কথা বিশ্বাস করে সওম পালন করেছেন এমন নয়। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে ইহুদীদের এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়েছিলেন অথবা তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে এর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন।

এ দিনে সওম পালনের ফজীলত সম্পর্কে হাদীসে আরো এসেছে

عن أبي قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم والترمذي

আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আশুরার সওম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেনঃ " বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গৃহীত হয়।" বর্ণনায় ঃ মুসলিম, তিরমিজী

অন্য বর্ণনায় এসেছে

عن أبي قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . . . صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم

" আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ . . . . আশুরার দিনের সওমকে আল্লাহ তায়ালা বিগত এক বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।"
বর্ণনায় ঃ মুসলিম

হাদীসে আরো এসেছে

من صام عاشوراء غفر الله له سنة. رواه البزار وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب

"যে আশুরার সওম পালন করবে আল্লাহ তার এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" বর্ণনায়ঃ বাযযার
ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেনঃ "এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলঃ যে সওম পালনকারীর গুনাহ রয়েছে তার গুনাহের কাফফারা হবে আর যার গুনাহ নেই আশুরার সওম তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।"
(ফাযায়েলুল আওকাত: বায়হাকী)
মোট কথা আশুরার দিনের সওম হল এক বছরের সওমতুল্য।
রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সওমকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري و مسلم

ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ "আমি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ সওম ছাড়া অন্য কোন সওমকে এত গুরুত্ব দিতে দেখিনি। আর তা হল আশুরার সওম ও এই রমজান মাসের সওম।"
বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম
আমাদের সালফে সালেহীন এ সওমকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন। এমনকি সফরে থাকাকালীন সময়েও তারা এ সওমকে পরিত্যাগ করতেন না। যেমন ইমাম

ইবনে রজব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস রা., আবু ইসহাক আস-সাবেয়ী, ইমাম যুহরী (রহঃ) প্রমুখ বলতেনঃ "রমজানের সওম কোন কারণে ছুটে গেলে অন্য সময়ে আদায় করার সুযোগ থাকে কিন্তু আশুরার সওম ছুটে গেলে আর রাখা যায় না।"
(লাতায়েফুল মাআ'রিফ : ইবনে রজব)
তাই তারা সফরে থাকা অবস্থায়ও আশুরার সওম আদায় করতেন। নেক কাজে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে এই ছিল আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের আদর্শ।

আশুরার সওমের ইতিবৃত্ত ও তার বিধান

ইসলামের সূচনা থেকে তার পরিপূর্ণতা লাভ পর্যন্ত আশুরার সওমের বিধান এক ধরনের ছিলনা।
সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর যে পরিবর্তন হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ
১. ইসলামের সূচনাতে মক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওম পালন করতেন, কিন্তু অন্যকে এ সওম পালন করতে হুকুম করেননি।
২. রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনাতে আগমন করলেন তিনি ইহুদীদের সওম পালন করতে দেখলেন তখন তিনি সওম পালন করলেন অন্যদের সওম পালন করতে নির্দেশ দিলেন। এমনকি যারা আশুরার দিনে আহার করেছিলেন তাদের দিনের বাকী সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। আর এটা ছিল হিজরতের দ্বিতীয় বছরে। কেননা তিনি হিজরতের প্রথম বছর মুহাররম মাস শেষ হওয়ার একমাস পর অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসে মদীনাতে আগমন করেছিলেন।
৩. হিজরতের দ্বিতীয় বছর যখন রমজান মাসের সিয়াম ফরজ করা হল তখন আশুরার সওমের ফরজিয়্যত (অপরিহার্যতা) রহিত হয়ে গেল এবং তা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হতে লাগল। অতএব বলা যায় এক বছরের জন্য এ সওম পালনের ফরজ নির্দেশ জারী হয়ে ছিল।
(ফতহুল বারী)
৪. আশুরার সওম পালন সুন্নাত। আর তার সংখ্যা হবে দুটি। মুহাররম মাসের নবম ও দশম তারিখে অথবা দশম ও একাদশ তারিখে।
উপরে যে আশুরার সওমের চারটি ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হল তা বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
এর মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصومه، فلما فرض شهر رمضان قال : (من شاء صامه ومن شاء تركه) رواه البخاري ومسلم

'আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সওম পালন করত এবং রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সওম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন তখন তিনি এ সওম পালন করলেন ও অন্যদের পালন করতে আদেশ দিলেন। যখন রমজান মাসের সওম ফরজ হল তখন তিনি আশুরার সওম সম্পর্কে বললেনঃ "যার ইচ্ছা আশুরার সওম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দিবে।" বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، التي حول المدينة ((من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه))

فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار.

رواه مسلم

'মহিলা সাহাবী রবী বিনতে মুয়াওয়াজ রা. থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার দিনে ভোরে মদীনার নিকটবর্তী আনসারদের মহল্লায় খবর পাঠালেন যে, তোমাদের মধ্যে যে সওম শুরু করেছে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর যে সওম শুরু না করে খাওয়া-দাওয়া করেছে সে যেন দিনের বাকী সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শোনার পর আমরা সওম পালন করলাম এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ছোট ছেলে-মেয়েদের দিয়ে সওম পালন করালাম। আমরা তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম। বাজার থেকে খেলনা কিনে নিতাম। যখন খাবার চাইত তখন হাতে খেলনা তুলে দিতাম, যেন তারা খাবারের কথা ভুলে গিয়ে সওম পূর্ণ করতে পারে। বর্ণনায়ঃ মুসলিম

উপরোক্ত হাদীস দুটি দ্বারা বুঝে আসে আশুরার সওম তখন ওয়াজিব ছিল।

কতিপয় আলেমের মত হল আশুরার সওম কখনো ওয়াজিব ছিলনা। এ কথার সমর্থনে তারা দলীল হিসেবে মুয়াবিয়া রা. এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন ঃ

قال معاوية رضى الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر) رواه البخاري ومسلم

" মুয়াবিয়া রা. বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ "এটা হল আশুরার দিন। এর সওম আল্লাহ তোমাদের উপর ফরজ করেননি। কিন্তু আমি সওম পালন করছি। তোমাদের যার কাছে ভাল লাগে সে যেন সওম পালন করে। আর যার খেতে মনে চায় সে খাওয়া-দাওয়া করতে পারে।" বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন মুয়াবিয়া রা. এর এ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, আশুরার সওম কখনো ওয়াজিব ছিল না। বরং তার কথার অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা রমজানের সওমের মত আশুরার সওম স্থায়ীভাবে ফরজ করেননি। আর আশুরার সওম যখন ফরজ ছিল তখন মুয়াবিয়া রা. ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গ লাভ করেছেন হিজরতের অষ্টম বছর থেকে। তাই তিনি আশুরার সওম ফরজ হওয়ার বিষয়টি অবগত ছিলেন না। যারা হিজরতের দ্বিতীয় বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা আশুরার সওম ফরজ হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন। আর আশুরার সওম যে রমজানের সওম ফরজ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব ছিল এ বিষয়ে অসংখ্য সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন-

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه. رواه مسلم

সাহাবী জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার দিনে সওম পালনের জন্য আমাদের হুকুম দিতেন, উৎসাহিত করতেন, আমাদের ওয়াদা নিতেন। কিন্তু যখন রমজানের সওম ফরজ হল তখন তিনি আমাদের আদেশ দিতেন না আর আশুরার সওম পালন করতে নিষেধও করতেন না।

বর্ণনায় ঃ মুসলিম
আশুরার সওম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্র করলে যে ফলাফল আসে তা হল ঃ
(ক) আশুরার সওম ফরজ ছিল, কারণ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা পালন করার জন্য হুকুম করেছিলেন।
(খ) এ সওম পালনের জন্য রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণভাবে ফরমান জারী করেছিলেন।
(গ) যারা এ দিনে পানাহার করেছিলেন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন।
(ঘ) যখন রমজানের সওমের হুকুম নাযিল হল তখন থেকে আশুরার সওমের ফরজিয়্যত বা অপরিহার্যতা রহিত হয়ে গেল।
যেমন ইবনে মাসউদ রা. বলেছেনঃ

لما فرض رمضان ترك عاشوراء. رواه مسلم

"যখন রমজানের সওম ফরজ হল আশুরার সওম ত্যাগ করা হল।"
বর্ণনায়ঃ মুসলিম
'আশুরার সওম ত্যাগ করা হল' একথার অর্থ হল ফরজ সওম হিসেবে আশুরার সওম ত্যাগ করা হয়েছে ; কিন্তু সুন্নাত হিসেবে এখনো বহাল আছে। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আশুরাতে সওম পালন করতেন।
তাই সর্ব-সম্মত কথা হল আশুরার সওম প্রথমে ফরজ ছিল, এখন তা ফরজ নয়, সুন্নাত।
ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেছেনঃ আশুরার সওম মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে উম্মাতের ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
তাই এটা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।
যেমন হাদীসে এসেছে

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري وسلم

ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ "আমি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ সওম ছাড়া অন্য কোন সওমকে এত গুরুত্ব দিতে দেখিনি। আর তা হল আশুরার সওম ও এই রমজান মাসের সওম।"
বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম

ইবনে আব্বাস রা. আরো বলেনঃ যারা বলে যে, আশুরার সওম তেমন গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব নয়, সাধারণ মুস্তাহাব। তাদের এ কথা ঠিক নয়। আসল কথা হল এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব আমল। তাইতো আমরা দেখতে পাই আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আশুরাতে সওম পালন করতেন। এমনকি ইন্তেকালের বছরও তিনি বলেছিলেনঃ

لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر . رواه مسلم

" যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আগামী বছর মুহাররম মাসের নবম ও দশম তারিখে সওম পালন করব।"

বর্ণনায়ঃ মুসলিম

এবং এ সওম পালন দ্বারা এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

এ সকল হাদীস দ্বারা আশুরার সওমের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. আশুরার সওম পালন পছন্দ করতেন না। তিনি এ সওম পালন করতেন না। এর দ্বারা আশুরার সওমের গুরুত্ব খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তার সওম পালন না করার ব্যাপারটা তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগি বা ইজতিহাদ। যা কখনো সহীহ হাদীসের সমতুল্য হতে পারেনা। তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগি দ্বারা কোন সহীহ হাদীসের আমল রহিত হতে পারেনা।

আশুরার সওমের ব্যাপারে ইহুদীদের বিরোধীতা করার নির্দেশ

যে সকল বিষয়ে কোন শরয়ী হুকুম অবতীর্ণ হয়নি মদীনায় আসার পর সে সকল বিষয়ে নবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের অনুরূপ আমল করা পছন্দ করতেন। যেমন তিনি মসজিদুল আকসাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীরা যেন ইসলামকে নিজেদের ধর্মের মতই মনে করে, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরে যখন সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে ইহুদীদের অবাধ্যতা, হিংসা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা,বর্ণবাদী নীতি ও চরম সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পেল তখন সকল ব্যাপারে তাদের বিরোধীতা করার নির্দেশ দেয়া হল এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাদের সাথে সাদৃশ্যতাপূর্ণ সকল আমল ও আচরণ করতে নিষেধ করা হল।

তাই রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংকল্প করলেন আশুরার দিনে তিনি ইহুদীদের মত আর একটি করে সওম পালন করবেন না। বরং এ সওমের সাথে মুহাররম মাসের নবম তারিখে একটি সওম বাড়িয়ে রাখার মাধ্যমে ইহুদীদের ধর্ম ও সাংস্কৃতির বিরোধীতা করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বহু হাদীস এসেছে।

যেমন

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع)

قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওম পালন করলেন ও অন্যকে পালন করার নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেনঃ "এটা তো এমন এক দিন যাকে ইহুদী ও খৃষ্টানরা সম্মান করে থাকে।" তখন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ
"আগামী বছর আসলে ইনশাআল্লাহ আমরা নবম তারিখে সওম পালন করব।" ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ "পরবর্তী বছর আসার পূর্বেই রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করলেন।"
বর্ণনায়ঃ মুসলিম
এ হাদীস দেখে এ কথা বুঝে নেয়ার অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওমটা মুহাররম মাসের দশ তারিখের পরিবর্তে নবম তারিখে পালনের সংকল্প করেছিলেন। বরং তিনি সংকল্প করেছিলেন নবম ও দশম দু দিন সওম পালন করার। কেননা আশুরা হল দশম তারিখ। সেদিন বাদ দিয়ে সওম পালন করলে তা আশুরার সওম বলে গণ্য হয় কিভাবে?
হাদীসে এসেছে

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. رواه الترمذي عن عبد الله ابن عباس

"রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওম পালন করতে বলেছেন দশম তারিখে"
হাদীসে আরো এসেছে

قالت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء يوم العاشر. رواه الترمذي

আয়েশা রা. বলেনঃ নবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাররমের দশ তারিখে আশুরার সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।"
বর্ণনায়ঃ তিরমিজী
হাকাম ইবনুল আ'ওয়াজ নামে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা. কে আশুরার সওম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ

إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. رواه مسلم والترمذي

"যখন মুহাররম মাসের চাঁদ দেখবে তখন থেকে হিসেব করবে এবং নবম তারিখের সকাল থেকে সওম পালন করবে।"
বর্ণনায়ঃ মুসলিম ও তিরমিজী
ইবনে আব্বাস রা. এর এ উত্তর থেকে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশংকা নেই যে, আশুরার সওম আসলে কোন দিন; নবম না দশম তারিখে?
ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ "কেহ যদি আশুরা সম্পর্কিত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা সমূহ একত্র করে পড়ে দেখে তা হলে তার সামনে কোন বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা থাকবেনা এবং সে ইবনে আব্বাস রা. এর ইলম ও প্রজ্ঞার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবে। বর্ণিত হাদীসে প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেননি যে আশুরা নবম তারিখে। তিনি শুধু নবম তারিখে সওম আরম্ভ করতে বলেছেন।
(যাদুল মাআ'দ)
হাদীসে এসেছে

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. رواه أحمد

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "তোমরা আশুরা দিবসে সওম পালন কর ও এ ক্ষেত্রে ইহুদীদের বিরোধীতা কর। তাই তোমরা আশুরার একদিন পূর্বে অথবা একদিন পরে সওম পালন করবে। বর্ণনায় ঃ আহমদ
এ হাদীসে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ঃ
(১) রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার দিনে সওম পালন করতে বলেছেন। তাই আশুরার দিনকে বাদ দিয়ে সওম পালন করলে তা আশুরার সওম হবে না।
(২) আশুরার সওম পালনের ক্ষেত্রে ইহুদীদের বিরোধীতা করতে হবে। তাই ইহুদীদের মত দশম তারিখে একটি মাত্র সওম পালন করা যাবে না।

(৩) আশুরার একদিন পূর্বে সওম পালন করতে হবে।
(৪) যদি আশুরার পূর্বের দিন সওম পালন করা কোন কারণে সম্ভব না হয় তাহলে আশুরা ও তার পরের দিন সওম পালন করতে হবে।
হাদীসের অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়

صوموا يوما قبله ويوما بعده.

"তোমরা আশুরার একদিন পূর্বে এবং একদিন পরে সওম পালন কর।"
এ হাদীসটি সহীহ নয়।
(জয়ীফুল জামে' : আলবানী)
অতএব আশুরার দিন বাদ দিয়ে আশুরার একদিন পূর্বে ও একদিন পরে সওম পালন করা ঠিক হবে না। তেমনি আশুরার দিন সহ একদিন পূর্বে ও একদিন পরে মোট তিনটি সওম পালন করাও ঠিক হবে না।
ইতিপূর্বে উল্লেখিত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসে 'অথবা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আশুরার দিন সহ তার পূর্বের দিন অথবা তার পরের দিন সওম পালন করতে হবে।
ইহুদীদের ধর্মীয় আচারের বিরোধীতা করার জন্য এ পদ্ধতিতে সওম পালন করা হবে ।
যেমন হাদীসে এসেছে

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر يوصومونه يوم عاشوراء، يتخذونه عيدا، ويلبسون نسائهم فيه حليهم وشاراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصوموه أنتم) رواه البخاري ومسلم

আবু মুছা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ খায়বর অঞ্চলের ইহুদীরা আশুরার দিনে সওম পালন করত ও ঈদ উদযাপন করত। এ দিনে তাদের মেয়েরা অলংকারাদি পরিধান করত ও তারা উত্তম পোষাকে সজ্জিত হত। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "তাহলে তোমরা সেদিনে সওম পালন করবে।"
বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম
এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানতে পারা যায়ঃ
(১) অঞ্চল ও গোত্র ভেদে ইহুদীদের ধর্মীয় আচরনের বিভিন্নতা। মদীনার ইহুদীরা শুধু সওম পালন করত আর খায়বারের ইহুদীরা সওম পালন ও উৎসব পালন করত।

(২) যেহেতু এ দিনে ইহুদীরা ঈদ পালন করত। আর সওম হল ঈদের বিরোধী। তাই সওম পালন করে তাদের ঈদের বিরোধীতা করার নির্দেশ দিলেন আল্লাহ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।
(৩) সওম ও ঈদ পরস্পরের বিরোধী। তাই তা একই দিনে একত্র হতে পারে না।
(৪) আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ বাণীটি ইসলামের শেষ দিকের। কারণ খায়বর বিজয় ও হাদীসের বর্ণনাকারী আবু মুছা আল-আশ'আরীর রসূলের সঙ্গ লাভ তাঁর জীবনের শেষ দিকের ঘটনা। যদিও আবু মুছা রা. ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কী জীবনে।
ইবনে রজব (রহঃ) বলেনঃ "এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল এ দিনকে উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর কাফির মুশরিকদের ঈদের সাথে সংহতি প্রকাশ না করে ঐদিনে সওম পালন করে তাদের উৎসবের বিরোধীতা করতে বলা হয়েছে।"
(লাতায়েফুল মাআ'রিফ)

কিভাবে পালন করবেন আশুরার সওম

আশুরার সওম পালন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্র করলে আশুরার সওম পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়ঃ
(ক) মুহাররম মাসের নবম ও দশম তারিখে সওম পালন করা। এ পদ্ধতি অতি উত্তম। কারণ রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই আশুরার সওম পালনের সংকল্প করেছিলেন। যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস এর প্রমাণ বহন করে।
(খ) মুহাররম মাসের দশম ও একাদশ দিবসে সওম পালন করা। এ পদ্ধতিও হাদীস দ্বারা সমর্থিত।
(গ) শুধু মুহাররম মাসের দশম তারিখে সওম পালন করা। এ পদ্ধতি মাকরূহ। কারণ এটা ইহুদীদের আমলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
(ইকতেজাউ সিরাতিল মুস্তাকীম: ইমাম তাইমিয়া) ও (রদ্দুল মুহতার : ইবনে আবেদীন)
কোন কোন আলেমের মতে আশুরা উপলক্ষে নবম, দশম ও একাদশ তারিখে মোট তিনটি সওম পালন করা ভাল। এতে আশুরার ফজীলত লাভ করার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ থাকে না।
তবে সর্বাবস্থায় এ রকম আমল করা ঠিক হবে না। এভাবে আমল তখনই করা যেতে পারে যখন আশুরার তারিখ নিয়ে সন্দেহ দেখা যায়।

যেমন মুহাম্মাদ বিন সীরিন (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মুহাররমের তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিলে তিনি উপরোক্ত নিয়মে তিনটি সওম পালন করেন। (ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার) ও (যাদুল মাআ'দ : ইবনুল কায়্যিম)

শরীয়তের মানদন্ডে আশুরার প্রচলিত আমলসমূহ

মুসলিম জনসাধারণের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন যে, তারা এ আশুরাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এবং এ কাজগুলো তারা আশুরার আমল মনে করেই করে থাকে। যেমন আশুরার রাত্রি জাগরণ, বিভিন্ন প্রকার উন্নত খাবারের ব্যবস্থা, পশু জবেহ, আনন্দ-ফূর্তির প্রকাশ, আবার কারবালায় ইমাম হুসাইন রা. এর শাহাদাতের স্মরনে মাযারের প্রতিকৃতি বানিয়ে তা নিয়ে মাতম ও তাযিয়া মিছিল বের করা, মাহফিল ও আলোচনা সভা ইত্যাদি।

এগুলো বিভ্রান্ত শিয়া ও রাফেজীদের কাজ হলেও দুঃখজনক ভাবে আমাদের সাধারণ মুসলিম জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই আমাদের জেনে নিতে হবে কোনটা আশুরা সম্পর্কিত আমল আর কোনটা ভেজাল বা বিদ'আত।

যদি আমাদের আমলগুলো শরীয়ত সম্মত হয় তা হলে তা দ্বারা আমরা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও সওয়াব লাভ করতে পারব। আর যদি আমলগুলো শরীয়ত সমর্থিত না হয়, বিদ'আত হয়, তাহলে তা পালন করার কারণে আমরা গুনাহগার হবো। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পরিবর্তে তার থেকে দূরে সরে পড়ব।

আমাদের সর্বদা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, যে কোন আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে কবুল হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে। একটি হল ঃ আমলটি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল ঃ আমলটি অবশ্যই আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে হতে হবে। সোজা কথায় রাসূলের তরীকায় হতে হবে। যদি আমরা আশুরার অতীত ও বর্তমানের প্রচলিত কাজ-কর্মের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, এ সকল কার্যাবলী ও অনুষ্ঠানাদি দু ভাগে বিভক্ত।

এক. প্রচলিত আমলগুলো ইবাদত হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু সেগুলো এ দিনের সাথে খাছ (সংশ্লিষ্ট) নয়। যেমন আশুরার রাতে জাগ্রত থেকে নফল সালাত আদায় করা, কবর যিয়ারত করা, দান-ছদকাহ করা, ফরজ যাকাত আদায় করা, খিচুরী বা বিরিয়ানী পাক করে মানুষদের মাঝে বিলি করা, রাস্তা-ঘাটে মানুষকে পানী পান করতে দেয়া ইত্যাদি। যদিও এ কাজগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিদ'আত নয় কিন্তু এগুলো আশুরার দিনের সাথে খাছ করা বিদ'আত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বা তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা সাহাবায়ে কেরাম রা. এ কাজগুলো আশুরার দিনের সাথে খাছ করেননি।

আর বিদ‘আত এমন একটি বিষয় যার এমন কোন সীমা নেই যেখানে গিয়ে সে থেমে যাবে। সে সামনে অগ্রসর হতে থাকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইবাদতের ক্ষেত্রের বিদ‘আতগুলো কখনো ইবাদতের সত্যিকার রূপ ধারণ ও পরিবর্তন করে, ফলে মনেই হয় না যে, এ কাজটা বিদ‘আত হতে পারে। যেমন একটা বানোয়াট হাদীস আছে যে, আশুরার রাতে চার রাক‘আত সালাত আছে, তাতে একান্ন বার সূরা ইখলাছ পড়তে হয়।

দুই. যে সকল কাজ ইবাদত নয়, মানুষের অভ্যাসের অন্তর্গত। যেমন এ দিনে গোসল করা,সুরমা ব্যবহার করা, উন্নত মানের খাবার-দাবার আয়োজন করা, গরু-ছাগল জবেহ করা, মেলার আয়োজন করা ইত্যাদি। এগুলো শিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ থেকে এসেছে। তারা হুসাইন রা. এর শাহাদাত স্মরণে শোক প্রকাশ ও মাতম করে থাকে।

তারা আশুরা উপলক্ষে এমন কিছু আচার অনুষ্ঠান যোগ করেছে যা ইসলাম ধর্মে নেই। বরং এগুলো ইহুদী ও মুশরিকদের উৎসবের অনুকরণ।

কোন এক সফরে আমার পার্শ্বে এক শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক বসা ছিলেন। তিনি এক কলেজের প্রফেসর। আমি তার কাছে হিন্দু ধর্মের বিধি-বিধান ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য কিছু প্রশ্ন করলাম। তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যেন আমি বুঝে নেই তাদের প্রতিটি আচার-পর্বের সাথে ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মিল আছে।

আমি তাকে প্রশ্ন রাখলাম “আচ্ছা ভাই, আপনাদের রথ যাত্রাটা কি?

উনি বললেনঃ “কেন, এটাতো আপনাদের মহররমের তাযিয়া মিছিলের মতই।”

তার এ উত্তর শুনে আমি চুপ হয়ে গেলাম।

আমি কখনো তাযিয়া মিছিলে অংশ নেইনি ও রথযাত্রাও প্রত্যক্ষ করিনি। তবে বিভিন্ন মিডিয়াতে একাধিকবার এ দুটোর যে ছবি দেখেছি তাতে উভয়ের দৃশ্য আমার কাছে এক রকমই মনে হয়েছে।

এ দিনে চোখে সূরমা ব্যবহার করা সম্পর্কিত যে হাদীস রয়েছে তার সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

মোট কথা হল আশুরার সাথে সওম ব্যতীত অন্য কোন আমলের সম্পর্ক নেই। আশুরার আমল শুধু একটা। তা হল সওম পালন করা। এটাই হল রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রদর্শিত পথ ও তার আদর্শ।

এ ছাড়া আশুরাকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হবে সবই বিদ'আত হিসেবে পরিগণিত হবে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا (الأحزاب: ٢١)

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ।"
সূরা আহযাব ঃ ২১

আশুরা সম্পর্কে প্রচলিত ভুল আকীদাহ-বিশ্বাস

শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন 'আশুরা কি?' তারা উত্তরে বলবে এ দিনে আমাদের মহান ইমাম হুসাইন আ. কারবালাতে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন। তাই এ দিনটি পবিত্র।
যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করেন 'আশুরার তাৎপর্য কি?'
তখন তিনি এর সাথে এমন কিছু কথা বলবেন যার সমর্থনে কুরআন বা সহীহ হাদীসের কোন প্রমাণ নেই। তাদের বক্তব্য শুনে মনে হবে বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আশুরাতে ঘটিয়েছেন ও আগত ভবিষ্যতের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ আশুরাতে সংঘটিত করাবেন। পৃথিবীর সৃষ্টি ও ধংশ সবই নাকি এ দিনে হয়েছে ও হবে।
বলা হয়ে থাকে এ দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। আদম আ. এর সৃষ্টি এ দিনে হয়েছে। আদম আ. কে এ দিনে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ দিনে আদম ও হাওয়ার মিলন হয়েছিল আরাফাতের ময়দানে। উভয়ের তাওবা কবুল হয়েছিল এ দিনে। নূহ আ. এর প্লাবন এ দিনে হয়েছিল। প্লাবন শেষে নূহ আ. এর নৌকা এ দিনে জুদী পাহাড়ে ঠেকে গিয়েছিল। নবী ইদ্রীস আ. কে এ দিনে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। আইউব আ. এর দীর্ঘ রোগমুক্তি এ দিনে হয়েছিল। মাছের পেট থেকে ইউনূছ আ. এর মুক্তি লাভ এ দিনে হয়েছিল। মুছা আ. তাওরাত লাভের জন্য তূর পাহাড়ে এ দিনে গমন করেছিলেন। নমরুদের আগুন থেকে ইব্রাহীম আ. এ দিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইয়াকুব আ. এ দিনে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন। সুলাইমান আ. এ দিনে তার হারানো রাজত্ব ফিরে পেয়েছিলেন। ইছা আ. এর জন্ম এ দিনে

হয়েছিল। ইছা আ. কে এ দিনে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। এ দিনে কাবা শরীফের নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এ দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে।
আরো কত কিছু যে এ দিনে ঘটেছিল তা আপনি যেমন মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট অনেক ইমাম সাহেবের মুখে শুনতে পাবেন। তেমনি শুনতে পাবেন এ দিন সম্পর্কে যারা রেডিও, টিভিতে বক্তব্য রাখেন তাদের মুখে। যদি সম্ভব হত তাহলে তারা বলতেন "সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম ও মিরাজ আসলে এ দিনেই হয়েছিল।"
আমরা যতদূর খোঁজ-খবর নিয়েছি তাতে উপরোক্ত তথ্যগুলোর সত্যতার সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন প্রমাণ পাইনি। না আল-কুরআনে না রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসে আছে।
আমরা যারা দ্বীন প্রচারে ভূমিকা রাখি, মসজিদের ইমাম-খতীব, ওয়ায়েজীনে কেরাম, দাওয়াত কর্মী তারা কি পারি না এ সংকল্প নিতে যে, আমরা দ্বীন সম্পর্কে যা কিছু বলব তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বলব। যা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় তা আমরা বলবো না। আবার যা আল্লাহ ও তার রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আমরা তার থেকে কিছু বাড়িয়ে বলব না। আমরা কি জানিনা আল্লাহ তায়ালা দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। এবং তার রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উম্মতকে সর্বদা সতর্ক করে বলেছেনঃ

أيها الناس ! إياكم والغلو في الدين، فإن أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه ابن ماجه وصححه الألباني

"মানব সকল! সাবধান তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবেনা। তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংশ হয়ে গেছে।"
বর্ণনায়ঃ ইবনে মাজাহ
অনেকে বর্ণিত হাদীসে 'আল-গুলু' বা 'বাড়াবাড়ি' শব্দের অর্থ মনে করেন 'জবরদস্তি'। এটা ঠিক নয়। 'জবরদস্তি'র আরবী হল 'ইকরাহ'। ধর্মে বাড়াবাড়ি করা মানে ধর্মে যা নেই তা ধর্ম হিসেবে পালন করা বা ধর্মের বিধান পালনে সীমা লংঘন করা। অথবা ধর্মীয় আমলের সাথে কিছু সংযোজন করা। ইহুদী খৃষ্টানেরা এ রকম বাড়াবাড়ি করেই নিজেদের ধর্মকে ধ্বংশ করেছে।
আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবায়ে কেরাম আশুরার ফজীলতের ব্যাপারে যা বলেননি আমরা তা কেন বলব?
যদি আমরা এমনটি করি তাহলে শিয়া ও রাফেজীগন যে বাড়াবাড়ি করেন তার প্রতিবাদ করার আদর্শিক ও নৈতিক অধিকার আমাদের কিভাবে থাকে?

সম্মানিত পাঠক!

এ দিনের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। এ দিনকে খাটো করাতে আমাদের কোন লাভ নেই। ইতিহাসের সকল ঘটনা এ যদি দিনে ঘটে থাকে তাতে আমাদের ক্ষতি কি?

কিন্তু আমাদের কথা হল আশুরা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হতে হবে। যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই তা ইসলামের নামে প্রচার করা যাবে না। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। আর বর্ণিত তথ্যগুলো এমন বিষয় যা আকীদাহর সাথে সম্পর্কিত তাই ইজমা বা কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

তাই আমি অনুরোধ করবো যারা আশুরা সম্পর্কে মানুষদের জ্ঞান দিবেন তারা যেন সনদ-সূত্র ও দলীল-প্রমাণ বিহীন এ সকল অতিরিক্ত কথাগুলো পরিহার করে চলেন।

আশুরার দিন ভাল খাবার- দাবারের আয়োজন করা সম্পর্কে একটি হাদীস দেখা যায়। তাহলঃ

من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. قال الإمام أحمد : لا يصح هذا الحديث

"যে ব্যক্তি আশুরার দিনে তার পরিবারবর্গের লোকদের জন্য সচ্ছলতার (ভাল খাবার) ব্যবস্থা করবে আল্লাহ সারা বছর তাকে সচ্ছল রাখবেন।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়।

এ হাদীস মুতাবিক আমল করা যাবেনা কয়েকটি কারণেঃ

(১) হাদীসটির সকল সূত্র দুর্বল যেমন প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবনে কায়্যিম জাওযী (রহঃ) এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেনঃ

رواه الطبراني عن أنس مرفوعا، وفي إسناده الهيصم بن شداخ وهو مجهول، ورواه العقيلي عن أبي هريرة وقال: سليمان بن أبي عبد الله مجهول، والحديث غير محفوظ، وكل طرقه واهية ضعيفة لا تثبت

"তাবারানী হাদীসটি আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রে হাইছাম ইবনে শাদ্দাখ নামের ব্যক্তি অপরিচিত। এবং উকায়লী বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা রা. থেকে। এবং তিনি বলেছেনঃ এ সূত্রে সুলাইমান বিন আবি আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তি অপরিচিত। হাদীসটি সংরক্ষিত নয় আর এ হাদীসের প্রত্যেকটি সূত্র একেবারে বাজে ও খুবই দূর্বল।

(আল-মানারুল মুনীফ ফিসসহীহ ওয়াজ যয়ীফ : ইবনে কায়্যিম জাওযী -রহঃ)
(২) এ হাদীসটি রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই সকল সহীহ হাদীসের বিরোধী যাতে তিনি আশুরাতে সওম পালন করতে বলেছেন। সওম পালন করলে সে দিন কিভাবে ভাল খাবার আয়োজনের প্রশ্ন আসতে পারে ? এ বিষয়টির বিবেচনায় হাদীসটি মুনকার।
বলা যেতে পারে যে, দিনের বেলা সওম পালন করে তারপর রাতে ভাল খাবারের ব্যবস্থা করলে উভয় হাদীস মোতাবেক আমল করা যায়।
না, তা হতে পারেনা। কারণ ইতিপূর্বে আলোচিত সাহাবী আবু মূসা রা. বর্ণিত বুখারী মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, খায়বরের ইহুদীরা এ দিনে আনন্দ-উৎসব ও সচ্ছলতা প্রদর্শন করত। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধীতা করে সওম পালন করতে বলেছেন। অর্থাৎ সচ্ছলতা প্রদর্শন (ভাল খাবার ও পোষাক ব্যবহার) করা যাবে না। বরং এর বিরোধীতা করে সওম পালন করতে বলা হয়েছে। যদি এ দিনে ভাল খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয় তবে তা ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য আচরণ বলে গণ্য হবে।
(৩) অনেকে বলে থাকেন যে, আশুরাতে ভাল খাবার-দাবার সম্পর্কিত হাদীসটি একটি ফজীলতের হাদীস। তাই তার সনদ দুর্বল হলেও আমল করতে অসুবিধা নেই।
আসলে 'ফজীলত সম্পর্কিত হাদীস দুর্বল হলেও সর্বক্ষেত্রে তা আমল করা যায় বা হাদীসটি গ্রহণ করা যায়' এমন ধারণা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ তার অনুরূপ সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে তখন দুর্বল হাদীস তার সনদের দুর্বলতা কাটিয়ে 'হাসান' এর স্তরে পৌছে যেতে পারে। তখনই সে হাদীস মুতাবিক আমল করা বা হাদীসটি গ্রহণ করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কোন প্রমাণিত আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে দূর্বল সূত্রের হাদীস গ্রহণ করা যায়। এর অর্থ এ নয় যে কোন আমল প্রমাণ করার ক্ষেত্রে দূর্বল হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।
কিন্তু আলোচ্য হাদীসটির বিষয় বস্তুর সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। 'আমলের ফজীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য' এ নীতি সম্পর্কে কথা হল যে সকল আমল ও তার ফজীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে সে সকল আমলের ফজীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ (দুর্বল) হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যে আমলটি কুরআর বা সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিতই হয়নি তার ফজীলত কি ভাবে দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা যায়? এটা করলে তো দুর্বল হাদীস দ্বারা শরয়ী ভাবে অপ্রমাণিত একটি আমল প্রমান করা লাযেম (অপরিহার্য) হয়ে যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কুরবানী করা ও তার ফজীলত সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। একটি দুর্বল হাদীস পাওয়া গেল যাতে বলা হয়েছে '– – –কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে সওয়াব পাওয়া যাবে– – –'

এ হাদীসটির সনদ দুর্বল হলেও গ্রহণ করা যায় একারণে যে উল্লেখিত আমল ও তার ফজীলত সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিন্তু আশুরাতে 'ভাল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা' সম্পর্কিত আমলটি সহীহ্ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। ফলে এ হাদীসটি আমল করতে গেলে দুর্বল হাদীস দ্বারা আমল প্রমাণিত হয়ে যায়, শুধু ফজীলত নয়।

অপরদিকে এ হাদীসটি বুখারী মুসলিম বর্ণিত সহীহ্ হাদীসের খেলাফ। সে হিসেবে হাদীসটি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য।

(৪) আলোচ্য হাদীসটি যে শুধু মাত্র আমলের ফজীলতের কথা বলে তা নয়। এ হাদীসটি আকীদাহর সাথেও সম্পর্কিত। আর তা হল আশুরাতে আনন্দ-উৎসব করার আকীদাহ ও এর ফলে সাড়া বছর ভাল অবস্থায় থাকার ধারণা। অতএব আকীদাহর ক্ষেত্রে কোন দুর্বল সূত্রের হাদীস গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই।

কারবালার ঘটনার সাথে আশুরার কি সম্পর্ক ?

বর্তমানে আমরা দেখছি প্রায় সর্ব মহল থেকে আশুরার মূল বিষয় বলে কারবালার ঘটনাকেই বুঝানো হচ্ছে। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক নয়।

ইসলামের আগমনের পূর্বে আশুরা ছিল। যেমন আমরা হাদীস দ্বারা জানতে পেরেছি। তখন মক্কার মুশরিকরা যেমন আশুরার সওম পালন করত তেমনি ইহুদীরা মুছা আ. এর বিজয়ের স্মরণে আশুরার সওম পালন করত।

আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওম পালন করেছেন জীবনের প্রতিটি বছর। তার ইন্তেকালের পর তার সাহাবায়ে কেরাম রা. আশুরা পালন করেছেন। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর হিজরী ৬১ সালে কারবালার ময়দানে জান্নাতী যুবকদের নেতা, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় নাতী সাইয়েদুনা হুসাইন রা. শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা একটা হৃদয় বিদারক ঘটনা। ঘটনাক্রমে এ মর্মান্তিক ইতিহাস এ আশুরার দিনে সংঘঠিত হয়েছিল। আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা) ও তার সাহাবায়ে কেরাম যে আশুরা পালন করেছেন ও যে আশুরা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রেখে গেছেন তাতে কারবালার ঘটনার কোন ভূমিকা ছিলনা। থাকার প্রশ্নই আসতে পারেনা। কারবালার এ দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহবাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. আনাস বিন মালেক রা. আবু সাঈদ খুদরী রা. জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. সাহল বিন সায়াদ রা. যায়েদ বিন আরকাম রা. সালামাতা ইবনুল আওকা রা. সহ বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। তারা তাদের পরবর্তী লোকদের চেয়ে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার পরিবারবর্গকে অনেক বেশী ভালবাসতেন। তারা আশুরার দিনে কারবালার ঘটনার স্মরণে কোন কিছুর প্রচলন করেননি। মাতম,তাযিয়া মিছিল, আলোচনা সভা কোন কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে আশুরা পালন করেছেন তারা সেভাবেই তা অনুসরণ করেছেন। অতএব আমরা কারবালা কেন্দ্রিক যে আশুরা পালন করে থাকি, এ ধরণের আশুরা না রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করেছেন, না তার সাহাবায়ে কেরাম। যদি এ পদ্ধতিতে আশুরা পালন আল্লাহর রসূলের মুহব্বাতের পরিচয় হয়ে থাকত, তাহলে এ সকল বিজ্ঞ সাহাবাগণ তা পালন থেকে বিরত থাকতেন না, তারা সাহসী ছিলেন। তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। কিন্তু তারা তা

করেননি। তাই যে সত্য কথাটি আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, তা হলো আশুরার দিনে কারবালার ঘটনার স্মরণে যা কিছু করা হয় তাতে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবাদের রেখে যাওয়া আশুরাকে ভুলিয়ে দিয়ে এক বিকৃত নতুন আশুরা প্রচলনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

আশুরার দিনে সাইয়েদুনা হুসাইন বিন আলী রা. এর শাহাদাত স্মরণে যে তাযিয়া মিছিল করা হয়, যে মাতম করা হয়, আলোচনা সভার ব্যবস্থাসহ যা কিছু করা হয় এর সাথে ইসলামী শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই।

কারণঃ

রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারো জন্ম বা মৃত্যু দিবস অথবা শাহাদত দিবস পালন করেননি। তারপরে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের কোন আমল করেননি। কেহ বলতে পারেন কারবালার ঘটনা যদি রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় হত তাহলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে এর স্মরনে শোক ও মাতম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যেতেন।

আসলে এ ধারনা একেবারেই বাতিল। কারণ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে অনেক মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে। তাঁর প্রিয়তমা সহধর্মীনি খাদিজা রা. র ইন্তেকাল তাকে সহ্য করতে হয়েছে। সাহাবীয়া সুমাইয়া রা. শাহাদত বরণ প্রতক্ষ করতে হয়েছে। তাঁর সামনে তাঁর একাধিক সন্তান ইন্তে কাল করেছেন। উহুদের যুদ্ধে তার প্রিয় চাচা ও দুধ ভাই হামযা রা. শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি তার যে কত প্রিয় ছিলেন ও তার শাহাদতে তিনি যে কতখানি মর্মাহত হয়েছিলেন সীরাত পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন। তেমনি মুস‘আব বিন উমায়ের রা. সহ অনেক প্রিয় সাহাবী শহীদ হয়েছেন। তিনি তাদের জন্য অনেক ক্রন্দন করেছেনে। এমনকি ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে তিনি উহুদের ময়দানে তাদের কবর যিয়ারত করতে গিয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। সেখানে তাদের জন্য দু‘আ করেছেন। কিন্তু তাদের কারো জন্য তিনি শোক দিবস পালন করেননি।

উহুদ যুদ্ধের পর তিনি এক অঞ্চলের অধিবাসীদের দাবীর কারণে তাদেরই দ্বীনে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর প্রিয় সাহাবীদের মধ্য থেকে বাছাই করে শিক্ষিত সত্তর জন সাহাবীকে সে অঞ্চলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ‘বিরে মাউনা’ নামক স্থানে শক্ররা আক্রমন করে তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের মাত্র একজন জীবন নিয়ে মদীনায় ফিরে এসে এ নির্মম ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন যে, রাহমাতুললিল আলামীন হয়েও হত্যাকারীদের শাস্তি ও ধ্বংশ কামনা করে তিনি

বহু দিন যাবত তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকলেন। কোথায়! তিনি তো এ সকল মহান শহীদানের জন্য কোন দিবস পালন করতে নির্দেশ দিলেন না। প্রতি বছর শোক দিবস পালন করতে বললেন না।

মুতার যুদ্ধে তার তিনজন প্রিয় সেনাপতি সাহাবী শাহাদত বরণ করলেন। যায়েদ বিন হারিসা রা. জা'ফর বিন আবি তালিব রা. ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা.। আরো অনেকে। যায়েদ বিন হারেসা রা. কে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত ভালবাসতেন। রসূলুল্লাহর ভালবাসার স্বীকৃতি হিসেবে সকলে তার উপাধি দিয়েছিল 'হিব্বু রসূলিল্লাহ'। ইসলামের দাওয়াতের শুরু থেকে তিনি সর্বদা আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছায়ার মত থাকতেন। আর জা'ফর বিন আবি তালিব রসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি আলী রা. এর আপন ভাই ও সাইয়েদুনা হুসাইন রা. এর আপন চাচা ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. রসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের একজন ছিলেন। তাদের শাহাদাতের খবর মদীনাতে পৌছার পর রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতখানি শোকাবিভূত হয়ে পড়েছিলেন সীরাত ও ইসলামী ইতিহাসের পাঠক তা ভালভাবে জানেন। রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তাদের জন্য শোক দিবস চালু করেছিলেন? না প্রচলন করতে বলেছিলেন? কখনো তা করেননি।

তারা তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই যুদ্ধ করেই জীবন দিয়েছিলেন। এ সকল মহাপ্রাণ সাহাবীদের সাথে তাঁর যেমন ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক তেমনি ছিল দ্বীনে ইসলামের সম্পর্ক। কেহ বলতে পারবেন না যে তিনি তাদের কম ভালবাসতেন। তারপরও তিনি তাদের জন্য প্রতি বছর শোক পালনের ব্যবস্থা করলেন না।

এমনিভাবে রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম কতখানি ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন তা হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তারা তো প্রতি বছর দিবস পালনের প্রথা প্রচলন করলেন না।

এরপরে উমার রা. শহীদ হলেন, উসমান রা. শহীদ হলেন, শাহাদত বরণ করলেন আলী রা.। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম কারো জন্য শোক দিবস পালন করলেন না।

কারো জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস অথবা শাহাদত দিবস পালন ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামের কথা হল মানুষ মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে, ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে তার আমল বা কর্মের মাধ্যমে। বছরে একবার দিবস পালন করে কাউকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।

তাইতো দেখবেন কত নবী-রসূল, সাহাবা, ইমামগন, আওলিয়া, ন্যায় পরায়ন বাদশা, মনীষি রয়েছেন যাদের জন্য জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালিত হয় না। কিন্তু তারা

কি মানুষের হৃদয় থেকে বা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছেন? না, তারা মানুষের হৃদয় দখল করে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

কারবালার ঘটনার স্মরণে শোক ও মাতম করা প্রসঙ্গেঃ

আমাদের নেতা হুসাইন রা. এর উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। তিনি জ্ঞানী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তিনি মুসলিমদের নেতা। জান্নাতী যুবকদের নেতা। ইবাদত-বন্দেগী, সাহসিকতা-বীরত্ব, বদান্যতায় তিনি খ্যাত। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের সর্বকনিষ্ঠা আদরের দুলালী ফাতেমা রা. এর সন্তান। তার মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্বের সকল মুসলিম চরমভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত।

আল্লাহ আহকামুল হাকেমীন তার হত্যাকারীদের শাস্তি দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীতে তাদের লাঞ্চিত ও অপদস্থ করেছেন। তারা বিভিন্ন রকম আজাব গজবে পতিত হয়েছে। দুনিয়ার শাস্তি থেকে তাদের খুব কম লোকই নাজাত পেয়েছে।

এ সকল কিছু বাদ দিলেও এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে যে, ইমাম হুসাইন রা. এর হত্যায় যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ঘৃনা করবে, লা'নত ও ধিক্কার দিবে। তাদের নাম উচ্চারণ করার মত বিশ্বে কেহ অবশিষ্ট থাকল না। হুসাইন রা. কে নির্মূল করতে যেয়ে তারাই নির্মূল হয়ে গেছে।

সাইয়েদুনা হুসাইন রা. এর শাহাদাত ও এ জাতীয় মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণের সময় আমাদের কর্তব্য হবে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। বান্দার জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ তা সংঘটিত করে থাকেন। যারা তাঁর দ্বীনের জন্য কুরবানী পেশ করেন তাদের তিনি এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

হুসাইন রা. এর জন্য শোক প্রকাশ করতে যেয়ে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যা করে থাকে তা কখনো ইসলাম সম্মত নয়।

খলীফাতুল মুসলিমীন আলী রা. তার ছেলে হুসাইন রা. এর চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাকেও তো অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে। তার জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কেন মাতম করে না?

এমনি ভাবে উমার রা. ও উসমান রা. শহীদ হয়েছেন। তাদের জন্য কেন তারা শোক প্রকাশ করে না? তারা কি হুসাইন রা. এর চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন? সকলকে বাদ দিয়ে কেন শুধু হুসাইন রা. এর জন্য শোক ও মাতম করা হয়?

(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ইবনু কাসীর, ইকতেজাউ সিরাতিল মুস্তাকীম : ইবনু তাইমিয়া)

আসল কথা হলা মাতম করা, শোক প্রকাশ করতে যেয়ে উচ্চস্বরে আহাজারী করা, বুক চাপরানো, পোষাক ছিড়ে ফেলা, শরীর রক্তাক্ত করা এগুলো হল জাহেলী যুগের আচরণ।

যেমন হাদীসে এসেছে

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوة الجاهلية. رواه البخاري ومسلم

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "শোকে বেহাল হয়ে যে ব্যক্তি গাল চাপড়ায়, কাঁপড় ছিড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের ন্যায় আচরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম

عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. رواه البخاري ومسلم

উম্মে আতীয়া নুসাইবা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইয়াত গ্রহণকালে আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যেন আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশার্থে উচ্চ শব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে কান্নাকাটি না করি।

বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. رواه مسلم

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "দুটি বিষয় এমন যা মানুষের মধ্যে কুফরী বলে গণ্য হয় ঃ বংশধারা কে কলংকিত করা ও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশার্থে উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা।"

বর্ণনায় ঃ মুসলিম

সুপ্রিয় পাঠক!

আমাদের নেতা হুসাইন রা. যখন শাহাদাত বরণ করলেন তখনকার যূগে যদি কেহ তার জন্য অনুষ্ঠান করে কান্নাকাটি করত, আহাজারী করত, বুক চাপরাতো, শরীর

রক্তাক্ত করত, পোষাক ছিড়ে ফেলত, তাযিয়া মিছিল বের করত তাহলে তখনই বলা হত এ ধরণের কাজগুলো এ সকল হাদীসের আলোকে হারাম ও জাহেলী কাজ-কর্ম। আর আজকে এত বছর পরে তার জন্য শোক প্রকাশার্থে যদি কেহ এমন করে তাহলে তার পরিণামতো আরো ভয়াবহ হবে।

এ হাদীস সমূহে ' নিয়াহা' শব্দ এসেছে। 'নিয়াহা'র আভিধানিক অর্থ হল কান্নাকাটি করা। পরিভাষায় এর অর্থ উচ্চ আওয়াযে অনুষ্ঠান করে কান্নাকাটি করা। জাহেলী যুগে এক ধরনের পেশাদার লোক পাওয়া যেত। কোন বাড়ীতে কেহ মারা গেলে তাদের ডেকে কান্নাকাটির আয়োজন করা হত। যারা বিভিন্ন ভাবে উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করত। এর বিনিময় হিসেবে তারা টাকা পয়সা নিত। হাদীসের দৃষ্টিতে এ 'নিয়াহা' হারাম। তেমনি ভাবে কোন লোক ইন্তেকাল করলে তার নিকট আত্মীয় বিশেষ করে মহিলাগন কবিতা ও গানের সূরে যে কান্নাকাটি করে থাকেন তাকেও নিয়াহা বলা হয়। টাকার বিনিময় হোক আর শোকের কারণে হোক এ ধরনের 'নিয়াহা' ইসলামে নিষিদ্ধ।

ছোট বেলায় আমি দেখেছি দশই মুহাররমের দিন যে উৎসব হতো তাতে এক ধরনের লোকজন নিজেদের বুকে অনবরত ব্লেড বা চাকু দিয়ে আঘাত করে রক্ত ঝড়াতো ও হায় হোসেন! হায় হোসেন !! করত। আমি তখন বড়দের জিজ্ঞেস করতাম এই যে লোকগুলো এ রকম করছে অথচ তারা নামাজ, রোযা ইসলামী হুকুম আহকামের ধার ধারেনা, মদ গাঁজা খায়, বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায়। তারা কারবালার ঘটনা সম্পর্কেই বা কি জানে? হুসাইন রা. মর্যাদা সম্পর্কেই বা তাদের কি ইলম আছে? তারা নিজের শরীর রক্তাক্ত করার মত কিভাবে এত ত্যাগ স্বীকার করে? আমাকে উত্তর দেয়া হল এটা ত্যাগ স্বীকার নয় এর জন্য তারা টাকা পাবে। যারা তাদের এ কাজে নিয়োগ করেছে তারা তাদের প্রচুর টাকা দিবে।

সুপ্রিয় পাঠক!

আপনিই বলুন, এটা কি সেই জাহেলী যুগের নিয়াহা নয়? আপনি এখনো দেখবেন যারা এ দিনে হায় হোসেন! হায় হোসেন!! করে রক্ত ঝড়ায় তারা কিন্তু ভাড়াটে মাতমকারী। ভাড়ায় করুন অথবা স্বতস্ফূর্তভাবে করুন সর্বাবস্থায় এ আচরণ ইসলাম পরিপন্থী। ইসলাম মাতম করাকে হারাম করেছে।

এমনি অনেককে দেখা যায় যারা এ সকল মাতম ও তাযিয়া মিছিলের বিরোধী। কিন্তু তারা এ দিনে কারবালার করুণ ইতিহাস আলোচনা, সভা-সেমিনার, বিষাদ-সিন্ধু থেকে পাঠ ও মুহাররমের কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি করে থাকেন। আবৃত্তিকারী কাঁদো কাঁদো ভংগিতে পাঠ করে "নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া . . .।" শ্রোতারা

অনেকে অশ্রুশিক্ত হয়ে পড়েন। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, এটাও কিন্তু এক ধরনের নিয়াহা। মাতমের একটা অধিকতর সুশীল সংস্করণ।
তাই আশুরার দিনে মাতম, তাযিয়া মিছিল, ইতিহাস আলোচনার জন্য সভা-সমাবেশ, মেলার আয়োজন, কান্নাকাটি ইত্যাদির কোনটি ইসলাম সম্মত নয়। বিদ'আত ও মারাত্মক গুনাহের কাজ। এ সকল কাজ দ্বারা প্রকৃত আশুরাকে যেমন বিকৃত করা হয় তেমনি কারবালার ঘটনার সঠিক শিক্ষার প্রতি উপহাস করা হয়।
খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল কারবালার ঘটনার হাকীকত সম্পর্কে। তিনি বললেনঃ

سر داد مکر دست بدست یزید نه داشت

"তিনি মাথা দিলেন কিন্তু ইয়াযীদের হাতে হাত দিলেন না।"
(মাকতুবাত : শায়খ আহমদ সরেহিন্দ)
আমাদের নেতা হুসাইন রা. কীসের জন্য এ আত্ম ত্যাগ করলেন? এ জন্য যে আমরা এটাকে অবলম্বন করে মাতম করব? মাতমের অভিনয় করব? আর তার প্রিয় নানা সাইয়েদুল মুরসালীন (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলে গেলেন তা অমান্য করব? হুসাইন রা. যা অন্যায় মনে করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, সঠিক ও অবিকৃত ইসলামের স্বার্থে তার হাতে হাত না দিয়ে নিজেকে কুরবানী দিলেন। আর আমরা কি করছি?
হাত তো দূরের কথা আমরা আজ বাতিল শক্তির হাতে মাথা সপে দিয়েই তৃপ্ত হয়নি বরং আপাদ-মস্তক তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আর তার মুহব্বতের নামে যা ইসলাম সম্মত নয় তা ইসলামের নামে ইসলামে ঢুকিয়ে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত বিকৃত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজেদের অজান্তেই।
কারবালার ময়দানে তিনি যখন বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিতত হয়ে পড়লেন তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও! যেখানে নিরাপদ বোধ করবো আমি সেখানে যাবো।"
বিরোধীরা বলল, আপনি তাহলে আপনার চাচাতো ভাই হাকামের কাছে চলে যান। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আল-কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ سورة غافر : ٢٧

"যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করেনা, সে সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।"
সূরা মুমিন ঃ ২৭
(আল-বিদায়া ওয়াননিহায়াঃ ইবনু কাসীর)

তার দৃষ্টিতে হাকাম মুত্তাকী ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন না।
যাকে তিনি অন্যায়, অবিচার, আর দুর্নীতির ধারক মনে করেছেন তাকে তিনি সর্বদা এভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোন আপোষ করার চিন্তা তার মাথায় আসেনি। আজ আমরা তার অনুসারীরা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রুদের হাতে হাত মিলিয়ে আপোষ ও বন্ধুত্বের পতাকা বহন করে যাচ্ছি। স্বজাতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের মদদ দিয়ে যাচিছ। আর আশুরা আসলে হায় হোসেন! হায় হোসেন!! করছি।
এটাই কি হোসাইনী নীতি- আদর্শের সাথে আমাদের একাত্বতা প্রকাশের নমুনা?
কারবালার ঘটনার স্মরণে শিয়া সম্প্রদায়ের মাতম, তাযিয়া মিছিল, তলোয়ার দিয়ে মাথায় আঘাত করা, লোহার শিকল পড়া ইত্যাদি কার্যকলাপের সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক নেই।
শিয়া মতাবলম্বীরা অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত আকীদাহ পোষন করে। তাদের অনেক ধর্ম বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগী ভ্রান্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। এ কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে তাদের বিরুদ্ধে হাঁক ডাক করে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তে হবে। শ্লোগান দিতে হবে। বরং আমাদের কর্তব্য হলো তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা। তাদের হিদায়াতের জন্য প্রচেষ্টা চালানো ও তাদের ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে উম্মাতকে সতর্ক করা।
শিয়াদের কারবালা কেন্দ্রিক এ সকল কার্যকলাপের সাথে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া আশুরার কোন সম্পর্ক নেই। আশুরার দিনে কারবালার ঘটনামুখী কোন কিছু করার অর্থ হল দ্বীনে ইসলামের সঠিক আশুরাকে বিকৃত করা।
আর এ বিকৃতি শিয়াদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে।
আপনি দেখবেন যারা তাযিয়া মিছিল, মাতম ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আশুরা উদযাপন করে। কিন্তু আশুরার সওম পালনের ব্যাপারে কোন খবরই রাখেনা। বিশেষ করে তাযিয়া মিছিলে খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় সরবরাহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তারা এ দিনের সুন্নাত সওমের সাথে হয়ত বিদ্রুপ করে, নয়তো এটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারা যদি সওম পালন করত তাহলে কিভাবে পানি পান করে ও পানাহার করে?

আবেগ ও মহব্বত যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়

আল্লাহ ও তার রসূলকে মহব্বত করা ইসলামেরই নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালার রসূলকে সব কিছুর চেয়ে এমনকি নিজের জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতে হবে। এমনিভাবে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আহলে বাইত (পরিবারবর্গ) কে মুহাব্বত ঈমানের দাবী।

কিন্তু মহব্বত যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। যাকে মহব্বত করা হবে তার আদেশ যেন লংঘিত না হয়। যেমন কেহ মহব্বতের সাথে আল্লাহকে বলল "তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা, তুমি আমার পালনকর্তা, তুমি আমার রিযিক দাতা, তুমি আমার রক্ষাকর্তা।" তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং সে নেক আমল করল বলে গণ্য হবে। এ ধরনের কথার জন্য সে আল্লাহ তাআ'লার তরফ থেকে প্রতিদান পাবে। কিন্তু কেহ যদি প্রচন্ড মহব্বতে বলে 'হে আল্লাহ! তুমি আমার মহান পিতা। আমি তোমার এক অসহায় সন্তান।' তাহলে ব্যাপারটা কত মারাত্মক আকার ধারণ করে। আল্লাহকে মহব্বত করে তারই নির্দেশ লংঘন করা হল। যত গভীর মহব্বতের সাথে এ কথা বলা হোক না কেন আল্লাহ তা কবুল করবেন না। বরং তার নির্দেশ ও সীমা লংঘনের জন্য তিনি শাস্তি দিবেন।

এমনি ভাবে কেহ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মহব্বত করে বলল " আপনার প্রতি সালাত ও সালাম। আপনি সকল রসূলদের শ্রেষ্ঠ। আপনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়। আপনি শাফায়াতকারী "। এ সকল কথা যে বলল সে লাভবান হলো। ভাল কাজ করলো। কিন্তু সে যদি প্রচন্ড মহব্বতে বলেঃ " হে রাসূল! আপনি আমাদের ত্রাণকর্তা, আপনি সর্বত্র হাজির নাজির, আপনি আমাদের দেখতেছেন, আপনার জন্যই এ আসমান-যমীন সৃষ্টি করা হয়েছে , আপনি না হলে আসমান-যমীন কিছু সৃষ্টি করা হতোনা" তাহলে ব্যাপারটা কত মারাত্মক হয়ে যায়! সে তখন শিরক করার অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল ও আল্লাহর রাসুলের আদেশ অমান্য করল।

তিনি তো বলেছেনঃ

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم

" তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবে না যেমন খৃষ্টানেরা মারিয়ামের ছেলে (ইছা আঃ) র ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি একজন বান্দা। তোমরা আমার ব্যাপারে বলবে 'তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল।'

বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম

দেখুন রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মহব্বতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ খৃষ্টানেরা ইছা আ. এর সম্মান ও মহব্বতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাকে প্রভূর আসনে বসিয়ে তারা তাকে প্রভূ বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছে। ফলে তারা ধর্মচ্যুত হয়ে গেছে। তাই তোমরা আমার সম্মান ও মহব্বতের ক্ষেত্রে তাদের মত সীমা লংঘন করবে না।

এ বিষয়ে রসূলল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি হাদীস উল্লেখ করার মতঃ

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : جعلتني لله عدلا ؟ بل قل ما شاء الله وحده. رواه أحمد

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললঃ "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন (তাই হড়্গো)।"

তার এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে? বরং বল, একমাত্র আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন (তা-ই হবে)।" বর্ণনায় ঃ আহমদ

তিনি যেমন নিজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন তেমনি তার সন্ত ানদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি অপছন্দ করতেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে একটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সহ প্রায় সকল হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে

عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آياتان من أيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته . رواه البخاري

সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছেলে ইব্রাহীম ইন্তেকাল করলেন। সেদিন সূর্যগ্রহণ হল। মানুষেরা বলতে লাগল "ইব্রাহীমের ইন্তেকালের কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে।"

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে মাত্র দুটো নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুতে এর গ্রহণ হয় না।”
বর্ণনায়ঃ বুখারী
দেখুন আল্লাহর রসূলের প্রিয় সন্তান ইব্রাহীমের ইন্তেকালের দিন সূর্যগ্রহণ হল। লোকজন আবেগ বা মহব্বতে মন্তব্য করল ‘রসুলের সন্তানের ইন্তেকালের কারণে এ সূর্যগ্রহণ হয়েছে।’ কিন্তু আল্লাহ তাআ’লার রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিবাদ করে বললেন এটা ঠিক নয় যে, কারো মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ হবে।
এ হাদীসের দিকে তাকালে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেঃ
প্রথমত ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রিয় সন্তানের মহব্বতে কেহ একটু বাড়াবাড়ি করুক তা তিনি পছন্দ করেননি। তাহলে তার নাতী সাইয়েদুনা হোসাইন রা. এর মহব্বতে কোন বাড়াবাড়ি তিনি কি পছন্দ করতে পারেন?
দ্বিতীয়তঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসে যত কুসংস্কার ছিল ও আছে। তার মূলে আঘাত করেছেন। বলেছেন এগুলো সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে হয়ে থাকে।
তৃতীয়তঃ আমাদের সমাজে অনেক এমন পীর সাহেব দেখতে পাবেন তারা নিজেদের কারামাত বয়ান করা খুব পছন্দ করে থাকেন। আপনি কোন পীর সাহেব বা তার মুরীদদের উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে গেলেন। দেখবেন বক্তাগন প্রথমে হামদ ও সালাতের পর পীর সাহেবের কারামাত বয়ান করতে শুরু করলেন। তারপর পীর সাহেবের বাবার কেরামত, তারপর দাদা পীরের কারামাত, তারপর পীর সাহেবের মাতার কারামত, তারপর তার খলীফার কারামাত, তারপর তার খাদেমের কারামাত, তারপর তার মাদ্রাসার বাবুর্চির কারামত বয়ান করলেন। বরাদ্দকৃত এক ঘন্টা সময়ের পঞ্চান্ন মিনিট তিনি পীর সাহেবের পরিবারের কারামাত বয়ান করলেন। এ ধরনের কারামাত-পছন্দ কোন এক পীর সাহেবের ছেলের ইন্তেকালের দিন যদি হঠাৎ সূর্য গ্রহণ হতো তাহলে পীর সাহেব তার মুরীদদের বলার অপেক্ষা করতেন না। নিজেই বলা শুরু করতেন এটা তার প্রিয় সন্তানের ইন্তেকালের কারণে হয়েছে। তার কারামাতই বটে।
কিন্তু আলোচ্য হাদীসের দিকে তাকান! আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চূপ করে থাকতে পারতেন। মনে মনে বলতে পারতেন আমার ছেলের মহব্বত ও সম্মানে তারা একটা কথা বলছে বলুক! এটা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত। তাদের এ মন্তব্যে আমার কি আসে যায়? না, তিনি চূপ থাকতে পারেননি। দেখুন! তিনি রেছালাত ও আল্লাহর দ্বীনের প্রসারে কতখানি আমানতদার ছিলেন। তিনি

মানুষকে এমন ইসলামের দিকে আহবান করেছেন যে ইসলাম ছিল একশ ভাগ আল্লাহ কেন্দ্রিক। ব্যক্তি কেন্দিক মোটেই ছিল না। ছিল একশ ভাগ আল্লাহর তাওহীদ কেন্দ্রিক।

আর আমরা অনেকে আজ যে ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করছি তা হয় দল কেন্দিক, না হয় গোষ্ঠী কেন্দ্রিক, না হয় ছেলছেলা কেন্দ্রিক না হয় অঞ্চল কেন্দ্রিক, না হয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক।

কুরআন বা হাদীসের কোন একটি বিষয় সামনে আসলে তা যত গুরুত্বপূর্ণই হোকনা কেন প্রথমে আমরা দেখি তা আমাদের মাজহাব এর বিরোধী কিনা? বা আমাদের দলের নীতি আদর্শের পরিপন্থী কিনা? অথবা আমাদের দাওয়াতের উসূল বা আমাদের ছেলছেলার বিপরীত কোন বিষয় নির্দেশ করে কিনা? যদি এমন হয় তাহলে তার একটি যথার্থ ব্যাখ্যা অবশ্যই দাঁড় করাতে হবে। এ ধরণের সংকীর্ণ মনোভাবের কারণেই আমাদের ইসলাম পন্থীদের জন্য আজ আল্লাহর এ দুনিয়াটা দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে আমরা ততই কোণঠাসা হয়ে পড়ছি।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তার পরিবারবর্গকে মহব্বতের অর্থ এটা নয় যে, আপনি তাদের মহব্বতের নামে যা ইচ্ছা তা করবেন। মহব্বতের দাবী ও পরিচয় হল যাকে মহব্বত করবেন তার আনুগত্য করবেন। তাঁর কোন আদেশ-নিষেধের বাহিরে যাবেন না।

যে আশুরা রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেখে গেছেন, যেভাবে রেখে গেছেন আমাদের সেভাবেই রাখতে হবে। ঘটনা যত গুরুত্বপূর্ণ হোক, তা দিয়ে মূল আশুরাকে ঢেকে দেয়া যাবে না। এ রকম বলা যাবে না যে, 'আজ পবিত্র আশুরা, এ দিনে কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন শাহাদাত বরণ করেছেন।' কথা সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য সঠিক নয়। বিষয়টা খোলাসা করতে একটা সামান্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

আপনি এক কুয়েতী নাগরিককে জিজ্ঞস করলেন যে, ভাই বলুনতো আশুরার তাৎপর্য কি?

তিনি উত্তরে বললেনঃ "১৪১১ হিজরী সনের এ দিনে সাদ্দাম হোসাইনের নেতৃত্বাধীন ইরাকী বাহিনী আমাদের দেশ আক্রমন করে দখল করে নেয়। তারা আমাদের অনেককে হত্যা করে। আমাদের ইতিহাসে এটা ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা। এ ঘটনায় সাড়া বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায় . . ."

এখন আপনি বলুনতো এ ব্যক্তির বক্তব্য তো সত্য কিন্তু এটা কি সত্যিকার আশুরার তাৎপর্য?

তেমনি কারবালার ঘটনা চরম সত্য কিন্তু আশুরা মানে কারবালার ঘটনা নয়। তবে এভাবে বলতে দোষ নেই, আজ ১০ই মুহাররম। এদিনে কারবালায় সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হোসাইন রা. শাহাদত বরণ করেছেন।

কাফেরদের সৎকর্ম সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আশুরা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইহুদীরা আশুরাতে যে সওম পালন করেছিল রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা সমর্থন করেছেন। তাদের মত আশুরার সওম পালনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন।

এ বিষয়টি দেখে অনেকে বলতে পারেন যে, কাফির ও মুশরিকরা নেক আমল করলে সম্ভবত তা কবুল করা হয়। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের সওম পালন করতে দেখে তাদের বলেননি যে, "তোমাদের এ নেক আমল কোন কাজে আসবে না।"

আরো একটু এগিয়ে তারা বলতে পারেন 'বিশ্বের সকল ধর্মই সঠিক ও অনুসরণীয়। যে কেহ একটি ধর্ম পালন করলেই হলো।' এ ধরনের কথা ইদানীং বেশ শোনাও যায়।

আশুরার সওম পালন সম্পর্কিত এ সকল হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইহুদী ধর্মের স্বীকৃতি দেয়া। প্রথমত উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের কাছে ইসলামকে পরিচিত করা। ইহুদীরা নিজেদের আসমানী কিতাবের একমাত্র অনুসারী ভাবত ও অন্যান্যদের উম্মী বা মুর্খ মনে করত। আশুরার সওম পালন দ্বারা আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এ পয়গাম দিলেন যে ইসলাম উম্মীদের ধর্ম নয়। বরং এটা আসমানী ধর্ম। এ ধর্মে মূছা আ. কে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর এ কারণে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আসার পর বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ইহুদী ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং তাদের থেকে ইসলাম ধর্মের স্বীকৃতি আদায় করা ছিল উদ্দেশ্য।

আমলের সওয়াব ও ফজীলত তখনই পাওয়া যাবে যখন আল্লাহর দ্বীনকে সন্তুষ্ট চিত্তে, নির্ভেজাল তাওহীদের আকীদায়, কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি করা ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হবে।

সহীহ শুদ্ধ ঈমান-আকীদাহ ব্যতীত যত পর্ব, অনুষ্ঠান ও নেক আমল করা হোক না কেন তা অবশ্যই বৃথা যাবে।

যেমন আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

(التوبة : ١٧-١٨)

"মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে- এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সকল কর্ম ব্যর্থ। এবং তারা আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।
তারাইতো মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।"
সূরা তাওবা ঃ **১৭,১৮**

মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার মত মহৎ কর্মও কোন কাজে আসবে না যদি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের মুসলিম সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা ইসলামের কিছু পর্ব, কতিপয় অনুষ্ঠান, কয়েকটি দিবস খুব জাঁকজমকের সাথে পালন করে কিন্তু ইসলামের অনেক কিছুর ধার ধারে না। ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ ও কিছু প্রত্যাখানের নাম কখনো 'ইসলাম' হতে পারে না। এটা হল অভিশপ্ত ইহুদীদের খাছলত।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ (

البقرة : ٨٥)

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নয়।"
সূরা আল-বাকারাঃ ৮৫

এমনি অবস্থা তাদেরও যারা রমজানের সওম পালন করে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে না। অথবা ইসলাম ধর্মের পরোপকার ও মানুষের অধিকার রক্ষা বা জনকল্যানের বিষয়টি ভালভাবে গ্রহণ করেছে কিন্তু সালাত ও সওমকে নিষ্প্রোয়জন মনে করে। বা ইসলাম ও মুসলমানদের খুব খেদমত করে কিন্তু কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সকল ধর্মই রহিত হয়ে গেছে। সে সকল রহিত ধর্মানুযায়ী কোন আমলই আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ سورة آل عمران : ٨٥

“কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”

সূরা বাকারাহ ঃ ৮৫

ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে দুনিয়াতে কলুষতামুক্ত পবিত্র জীবন যাপন করা ও পরকালে চিরস্থায়ী শান্তিময় জীবন অর্জন করা।

যদি কাফিররা কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ দুনিয়াতে তাদেরকে এর বিনিময় দিতে পারেন কিন্তু আখিরাতে তাদের নসীবে আগুন ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

হাদীসে এসেছে

عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الكافر إذا عمل حسنة، أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة، يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته

وفي رواية : إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطهم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم

আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “কাফির ব্যক্তি যখন কোন ভাল কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময়ে দুনিয়াতে

সামান্য জীবিকা দান করেন। আর মুমিন ব্যক্তির বিষয় অন্য রকম ; আল্লাহ তায়ালা তার ভাল কাজের প্রতিদান আখিরাতের জন্য রেখে দেন এবং দুনিয়াতেও তার আনুগত্য অনুযায়ী জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন।"

হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় আছে "আল্লাহ ভাল কাজের ক্ষেত্রে কোন মুমিন ব্যক্তির উপর জুলুম করেন না। তিনি এর বিনিময় দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন এবং আখিরাতেও। কিন্তু কাফির ; সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সকল ভাল কাজ করবে আল্লাহ তার বিনিময়ে দুনিয়ার উপকরণ দিবেন। যখন সে পরকালে উপস্থিত হবে তখন তার ভাগ্যে কোন ভাল কাজের প্রতিদান থাকবে না।"

বর্ণনায় ঃ মুসলিম

বর্তমান সময়ের ইহুদী খৃষ্টানরা কী আশুরা পালন করে

হাদীসে এসেছে ঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يارسول الله ! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেনঃ "রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আশুরার দিনে নিজে সওম পালন করলেন ও অন্যদের সওম পালন করতে বললেন। তখন সাহাবাগন বললেনঃ "হে আল্লাহর রসূল! এটা তো এমন একটা দিন যা ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সম্মান করে থাকে।" রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা শুনে বললেনঃ " ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা নবম তারিখে সওম পালন করব।" ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ" আগামী বছর আসার পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করলেন।"

বর্ণনায় ঃ মুসলিম

এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে। তার মধ্যে একটি হলঃ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পূর্বের বছরও আশুরার সওম পালন করেছেন ও অন্যকে পালন করতে বলেছেন।

আরেকটি বিষয় হল আশুরার এ দিনটিকে ইহুদী ও খৃষ্টানরা উদযাপন করত বলে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের কাছে তথ্য প্রকাশ করলেন।

ইহুদী-খৃষ্টানরা এ দিনকে সম্মান করবে। এটা যুক্তি সংগত। কারণ মুছা আ. কে ইহুদীরা নবী ও ত্রাণকর্তা হিসেবে জানে এবং খৃষ্টানরাও তাকে নবী বলে জানে। এ দিনেই তো দীর্ঘ সংগ্রামের পর তিনি ফেরআউনের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়,হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় ইহুদী-খৃষ্টানেরা এ দিনকে সম্মানের সাথে উদযাপন করে অথচ বর্তমানে আমরা তাদের এ দিন উদযাপন করতে দেখি না।

সুপ্রিয় পাঠক!

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মদীনা ও খায়বরের ইহুদীদের মধ্যে আশুরা সম্পর্কে আচার-অনুষ্ঠানের ভিন্নতা ছিল। মদীনার ইহুদীরা আশুরাতে সওম পালন করত। আর খায়বরের ইহুদীরা এর সাথে আনন্দ উৎসব করত। অথচ তাদের মধ্যে আঞ্চলিক দূরত্ব ছিল মাত্র সত্তর মাইল। এ সত্তর মাইলের ব্যবধানে তাদের ধর্মীয় আচারে ব্যবধান তৈরী হয়ে গেছে। সময় ও কালের হিসেবে বর্তমান যুগের ইহুদীদের তাদের থেকে ব্যবধান তো অনেক বেশী। তাই তারা যদি আশুরাকে ভুলে যায় তাতে আমাদের ক্ষতি নেই। তাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। তারা নিজেদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে কখনো আন্তরিক ছিল না। না তাদের ধর্মীয় নেতারা, না তাদের রাজনৈতিক নেতারা। নিজেদের ধর্মের বিধি-বিধানের বিরোধীতায় লিপ্ত তাদের মত জাতি পৃথিবীতে দ্বিতীয় একটি পাওয়া যাবে না। তারা ধর্মের ব্যাপারে সর্বদা আম্বিয়া আলাইহিস্‌সালামের সাথে বিরোধীতায় জড়িয়ে পড়েছে। নবীদের হত্যা করেছে। সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনকে পর্যন্ত গালি দিতে কসূর করেনি। কখনো বলেছে আল্লাহ কৃপণ। আবার কখনো বলেছে আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী। ধর্মীয় বিধানের সাথে বিদ্রুপ করে তা ঔদ্ধত্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। করবে না কেন? এত কিছু করার পর তারা ইহুদীই থেকে গেছে। তারা মনে করে তাদের ধর্ম এমন আদর্শিক কোন বিষয় নয় যা কেহ পালন করলে তাদের মত ইহুদী হয়ে যাবে। বরং ইহুদীবাদ শুধু বংশ ও বর্ণের নাম। যারা এ বংশে জন্ম নিবে তারাই ইহুদী। সে নবীদের সম্পর্কে জানুক বা না জানুক, তাদের মান্য করুক বা অমান্য। এতে তাদের কিছু যায় আসে না। আর এ কারণে অন্য কোন মানুষ ইহুদী ধর্মে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ যে বর্ণের দিক দিয়ে ইহুদী নয় সে ইহুদী হওয়ার কল্পনা করতে পারে না। নিজ ধর্মের সাথে তারা যে কত বে-ঈমানী করেছে তার বর্ণনা আল-কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর তারা যে সকল অঞ্চলে গেছে, সে সকল স্থানের জীবন-ধারা গ্রহণ করেছে। অন্যদের আচার-ব্যবহারকে নিজেদের আচারে পরিণত করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের

ধর্ম কি বলে, তার প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তারা মূছা আ. এর সাথে থাকা অবস্থায় এক লোককে দেখেছিল মাটির মুর্তি বানিয়ে তাকে সিজদা করতে। এ দেখে তারা মূছা আ. কে বললঃ " তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্যেও এমন একটা নির্ধারণ করে দাও।"

তারা হাজার হাজার বছর ধরে যাযাবরের মত দেশে দেশে ঘুর বেড়িয়েছে। সে সকল দেশের মানুষের করুণা লাভের জন্য তারা নিজ ধর্মের সব কিছু ত্যাগ করে অন্যান্য পৌত্তলিক জাতির সাংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এইতো প্রায় তিন বছর পূর্বে কয়েকজন ইসরাইলী এসেছিল ভারতে হিন্দুদের কূম্ভ মেলা দেখার জন্য। সাগর তীরের সে মেলায় হিন্দু নারী-পুরুষ সকলে সমুদ্রে নেমে একত্রে গোসল করে আনন্দ -ফুর্তি করে থাকে। এ ইহুদীরা এটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়। দেশে গিয়ে ভূমধ্যসাগর তীরে হিন্দুদের কুম্ভ মেলার অনুরূপ বুম্ভ মেলা চালু করে।

(দৈনিক যুগান্তর ২৪ এপ্রিল২০০১)

প্রতি ডিসেম্বর মাসে ইহুদীরা আট দিন ব্যাপী হানুকা নামে একটি উৎসব পালন করে। তার অপর নাম ফেস্টিবল অফ লাইটস বা আলোক উৎসব। আমার ধারণা এটা তারা হিন্দুদের আলোর উৎসব (দিপাবলী) অনুকরণে গ্রহণ করেছে। কারণ একটা আসমানী ধর্মে আলো বা আগুনের পূজা বৈধ হতে পারেনা।

এভাবে তারা যুগে যুগে অন্যদের সাংস্কৃতি আচার-আচরণ গ্রহণ করে নিজেদের ধর্মীয় আচার-আচারণ ভুলে গিয়েছে।

ইহুদী খৃষ্টানগন তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করে না। অনুসরণ করে তাদের সাধু-পাদ্রী পুরোহিতদের কথা। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের সম্পর্কে বললেনঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ سورة التوبة : ٣١

" তারা তাদের পুরোহিত ও পাদ্রীদের প্রভূ রূপে গ্রহণ করেছে।"

সূরা তাওবা ঃ ৩১

তখন ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল যে, আমরা তো কোন পাদ্রী-পুরোহিতকে প্রভূ বলে মানি না।

রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেনঃ "আচ্ছা তারা যদি কোন বস্তুকে হারাম (অবৈধ) বলে তোমরা কি তা হারাম বলে মেনে নাও না ? তারা কোন বস্তুকে হালাল (বৈধ) বললে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নাও না? "

তারা বলল "হ্যাঁ"। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন এটাই হল তাদের প্রভূ বলে স্বীকার করা।

এমনিভাবে খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের নীতি আদর্শ ও বিধি-বিধান ধরে রাখতে পারেনি।

আজকে আমরা যে খৃষ্টান ধর্ম দেখতে পাই তার সুত্রপাত ৩২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কন্সট্যান্টি কর্তৃক রোমে খৃষ্টান ধর্মকে রাজ-ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার ফলাফল। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক (মুশরিক) তিনি জীবনে শেষ বয়সে নিরূপায় হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এবং রাজনৈতিক কারণে তখনকার পৌত্তলিক ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্মের সংমিশ্রন ঘটান। এবং পূর্ববর্তী বাইবেল (মূলত GNOSTIC BABLE) কে নিষিদ্ধ করেন।

একই ভাবে এ সময়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বানানো হয়। এ ভাবেই যীশুর একত্ববাদ ত্রিত্ববাদে পরিণত হয়।এর আগে তাকে সাধারণ নবী বা প্রফেট হিসেবেই দেখা হত।

(সূত্র ঃ ইসলাম দি অল্টারনেটিভ : মুরাদ হফম্যান)

ও (সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, ২৬ শে জুলাই ২০০৫)

যারা নিজেদের ধর্মকে ধরে রাখতে পারেনি। ইছা আ. চলে যাবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ধর্ম আমূল পরিবর্তন করে ফেলল। নিজেদের নবীর জীবনীটা সংরক্ষন করতে পারেনি। এ কাজে সামান্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আন্তরিক ইচ্ছা তাদের ছিল না। একজন মানুষকে ঈশ্বর বানিয়ে পুজা করতে আরম্ভ করল। যাদের ঐশী ধর্মের সংস্কারক হল একজন ভ্রান্ত পেগান (মুশরিক) সম্রাট। সে ধর্মের লোকেরা কিভাবে আশুরা ও তার শিক্ষা ধরে রাখতে পারে?

অন্যদিকে ইসলাম অনুসারীগণ আশুরাসহ সকল ধর্মীয় পর্ব পালন করেন চন্দ্র মাস হিসেবে অথচ ইহুদী ও খৃষ্টানেরা কখনো চন্দ্র মাস অনুযায়ী কোন পর্ব পালন করে না।

এখানেও তারা পৌত্তলিক সাংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছে। তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন তারা ব্যর্থ হয়েছে সপ্তাহের পবিত্র দিনটি বেছে নিতে।

হাদীসে এসেছে ঃ

عن أبي هريرة رضى الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم

الذي اختلفوا فيه هدانا الله له (قال: يوم الجمعة) فالناس لنا فيه تبع: فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. رواه البخاري و مسلم واللفظ لمسلم

আবু হুরাইরাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ " আমরা সর্বশেষ উম্মত, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হব অগ্রগামী। আমরাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করব। যদিও সকল উম্মতকে কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদের কিতাব দেয়া হয়েছে সকলের শেষে। এরপর যে দিনটি আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, সে দিন সম্পর্কে তিনি আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। (অর্থাৎ শুক্রবার) সে দিনের ব্যাপারে অন্যরা আমাদের পিছনে রয়েছে। ইহুদীরা আমাদের পরের দিন। এবং খৃষ্টানরা তারও পরের দিন।

বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম

এমনিভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানরা ধর্মীয় বিষয়ে চন্দ্র বছর অনুসরণ না করে সৌরবর্ষ অনুসরণ করে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে সাপ্তাহিক দিন নির্ধারণে। কিয়ামতে তারা মুসলিমদের পিছনে পরে থাকবে, যেমন তারা সাপ্তাহিক দিন উদযাপনের ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে গেছে।

আমরা এটাও বলতে পারি, হাদীসে যে সকল ইহুদীদের আশুরার সওম পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হল মদীনায় বসবাসরত ইহুদী। হাদীসে এ কথা বলা হয়নি যে আশুরার দিনে বিশ্বের সকল ইহুদী সওম পালন করত।

অতএব আজকের এ যুগে যদি ইহুদী ও খৃষ্টানরা আশুরা পালন না করে তাতে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসটি সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসতে পারে না।

কাফেরদের অনুসরণ না করা ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

উপরে আলোচিত আশুরা সম্পর্কিত হাদীসসমূহে আমরা দেখতে পাই যে,

(أ) قالوا :إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى.

(ب) صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما.

(ج) كان أهل خيبر يصومونه يوم عاشوراء، يتخذونه عيدا، ويلبسون نسائهم فيه حليهم وشاراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فصوموه أنتم)

(ক) সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেনঃ এটা এমন একটা দিন যা ইহুদী ও খৃষ্টানরা সম্মানিত মনে করে।

(খ) রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "তোমরা আশুরার সওম পালন করবে ও এ ক্ষেত্রে ইহুদীদের বিরোধীতা করবে। তার একদিন পূর্বে অথবা একদিন পরে সওম পালন করবে।"

(গ) খায়বর অঞ্চলের ইহুদীরা আশুরার দিনে সওম পালন ও ঈদ উদযাপন করত। এ দিনে তাদের মেয়েরা অলংকারাদি পরিধান করত ও তারা উত্তম পোষাকে সজ্জিত হত। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "তাহলে তোমরা সেদিনে সওম পালন করবে।"

এ সকল হাদীসে আমরা দেখতে পেলাম যে, আশুরা এমন একটি দিন যাকে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিমরা সম্মান করে। তারা এ দিনের ফজীলতের ব্যাপারে একমত। তা সত্বেও আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ক্ষেত্রে তাদের বিরোধীতা করার নির্দেশ দিলেন। আর এ শিক্ষা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এত প্রবল ভাবে অনুসরণ করেছেন ও এমন গভীর ভাবে অনুধাবন করেছেন যে, তারা রাসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পর্যন্ত বলেছেন ঃ এ আশুরা ইহুদী খৃষ্টানেরা যখন উদযাপন করে তখন আমরা উদযাপন কেন করব? তাদের এ প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরা পালনের ক্ষেত্রে কাফেরদের বিরোধীতা কিভাবে করা যায় তার দিক-নির্দেশনা দিলেন।

এ ছাড়া হাদীসে রাসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট বাণী রয়েছেঃ

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود وصححه الألباني

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ " যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভূক্ত বলে গণ্য হবে।

বর্ণনায় ঃ আবু দাউদ

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ "এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হলঃ যে কাফিরদের সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে কাফের হয়ে যাবে।

যদি এ বাহ্যিক অর্থ (কুফরীর হুকুম) আমরা নাও ধরি তবুও কমপক্ষে এ কাজটি যে হারাম (নিষিদ্ধ) তাতে কোন সন্দেহ নেই।”

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের আচার-আচরণের বিরোধীতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত আপনি হাদীস ও সীরাতের কিতাবে দেখতে পাবেন।

যেমনঃ

সালাতের জন্য লোকজনকে আহবান কিভাবে করা যায়, এ প্রসঙ্গে যখন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনায় বসলেন তখন কেহ প্রস্তাব করলেন সালাতের সময় হলে আগুন জালানো যেতে পারে। দূর থেকে আগুন দেখে লোকজন বুঝে নিবে এখন সালাত ও জামা‘আতের সময় হয়েছে।

আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন এটা পারসিক (অগ্নি-পুজারী) দের আচার।

অনেকে প্রস্তাব করলেন সালাতের সময় হলে ঘন্টাধ্বনি করা যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেনঃ “ঘন্টা বাজানো খৃষ্টানদের আচরণ।”

কেহ কেহ প্রস্তাব করলেন সালাতের সময় ঘোষণার জন্য বাঁশী বাজানো যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “বাঁশী বাজানো তো মুশরিকদের আচরণ।” তিনি এ প্রস্তাবটাও প্রত্যাখ্যান করলেন।

কেহ বললেনঃ ইহুদীদের মত শিংগা বাজানো যেতে পারে।

আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাও প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর আজানের প্রবর্তন করলেন।

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ “অনেক সময় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শনি ও রবিবার সওম পালন করতেন।

তিনি বলতেনঃ “এ দু দিন মুশরিক (ইহুদী ও খৃষ্টান) দের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। তাই এ দিনে সওম পালন করে তাদের ঈদের বিরোধীতা করা আমি পছন্দ করি।”

বর্ণনায় ঃ আহমদ

ইবনে উমার রা. বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “তোমরা মুশরিকদের বিরোধীতা কর; দাঁড়ি পূর্ণ কর আর গোঁফ ছোট কর।” অন্য এক বর্ণনায় এসেছে “ইহুদীদের বিরোধীতা কর।”

বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “ইহুদী ও খৃষ্টানেরা চুল ও দাঁড়িকে রঙ্গীন করে না। তোমরা চুল ও দাড়িতে মেহেদীর রং ব্যবহার করবে।”
বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম
এমনি ভাবে অসংখ্য হাদীস ও দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে আপনি দেখবেন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের বিরোধীতা করার জন্য মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছেন।
তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এ আদর্শে কতটা উদ্বুদ্ধ ছিলেন আশুরার হাদীস সমূহের প্রতি তাকালে কিছুটা অনুমান করা যায়।
উমার রা. এর খেলাফত কালে যখন ইসলামী সনের প্রচলনের বিষয় আলোচনা হচ্ছিল তখন কোন এক ব্যক্তি প্রস্তাব করেছিলেন যে ইসলামী সন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম দিন থেকে শুরু করা যেতে পারে। তখন এ প্রস্তাব প্রায় সকল সাহাবা এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে এটা খৃষ্টানদের নিয়ম-নীতির মধ্যে পড়ে। তারা তাদের নবীর জন্ম দিন থেকে সন গণনা করেছে। আমরা তা করবোনা। আমরা আমাদের নবীর হিজরত থেকে সন গণনা করবো। (উসূলুদ্দাওয়াহ)
আমীরুল মুমিনিন উমার রা. জেরুজালেম অধিকার করার পর সেখানে মসজিদ আকসা পুননির্মানের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে ইহুদীদের কেবলা সাখরাকে মসজিদের পিছনে রাখা হবে, না সম্মুখে রাখা হবে এ বিষয় তিনি অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চাইলেন। সাহাবীদের মধ্যে কা'ব আহবার রা. বললেনঃ “সাখরার পিছনে মসজিদ নির্মান করুন।”
এ কথা শুনে উমার রা. বললেন ইহুদীয়্যত (ইহুদীবাদ) তোমাকে জড়িয়ে ফেলেছে। আমি সাখরার সম্মুখে মসজিদ নির্মান করব। যাতে সালাত আদায়ের সময় এটা যেন মুসল্লীদের সম্মুখে না থাকে। ”
(আল-মানারুল মুনীফ : ইবনে কায়্যিম জাওযী)
কেননা ইহুদীরা এটাকে কেবলাহ মনে করে থাকে। তাই মুসলিমগণ যেন এটাকে সামনে নিয়ে সালাত আদায় না করে। বরং এটাকে পিছনে রেখে সালাত আদায় করবে। এতে ইহুদীদের বিরোধীতা করার ইসলামের নির্দেশ পালিত হবে।
সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের আদর্শের প্রতি এতটা একনিষ্ঠ ছিলেন বলেই তারা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন।
আজ আমরা অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশ গ্রহণ করি। তাদের ঈদের দিনে মুসলিম দেশে সরকারী ছুটি পালনের মাধ্যমে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করি।

তাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তাদের উৎসাহ যোগাই। তাদের ও তাদের উপাষ্য দেবতাদের গুণগান করি।
আসলে এ সকল কাজ করে আমরা কী অর্জন করতে চাই? আমরা কী তাদের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের মত উন্নত হবো বলে ধারণা করছি?
অনেক মুসলিম দেশ তো ইহুদী ও খৃষ্টানদের খুশী করার জন্য অনেক কিছু করেছে। নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। হিজাব নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন শিক্ষার মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। আরবী ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছে। তারপরও তারা কি ইহুদী-খৃষ্টানদের আপন হতে পেরেছে? তারা নিজেদের দেশকে উন্নত করতে পেরেছে? মোটেই পারেনি। বরং তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বারবার। শত চেষ্টা করেও তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে পারেনি আজ পর্যন্ত। যদি তাদের অনুসরণ করে কোন মুসলিম দেশ জাগতিক বিষয়ে উন্নতি করত, তাহলে দুনিয়ার স্বার্থে হলেও আমরা না হয় তাদের মত একটু করে দেখতাম। কোন জাতির অনুসরণ ও অনুকরণ করে উন্নতি অগ্রগতিতে তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা তাদের সমকক্ষ হওয়া যায়না। কাউকে অনুসরণ করতে গেলে তার পিছনে পিছনে চলতে হয়। উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন জাতিকে পরাজিত করে এগিয়ে যেতে হলে তাদের অনুকরণ ও আনুগত্যের মানষিকতা পরিহার করতে হয়। নিজেদের স্বকীয়তা ও আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা রাখতে হয়।
আমরা অমুসলিমদের এত তোষামোদ করি কী কারণে? হয়ত আমরা এমন যে নিজেরা মুসলিম হয়েছি বলে নিজেদের হতভাগ্য মনে করে আফসোস করি। মনে মনে বলি, যদি তাদের ধর্মের হতে পারতাম! বা আমাদের ধর্মটা এমন না হলেও চলত। অথবা মনে করি, এ দুনিয়াটা তাদের লীজ নেয়া। তাদের তোষামোদ না করলে এ দুনিয়া আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী আর আমরা খুব দুর্বল। বা তাদের তোষামোদ করে নিজেদের উদারতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করতে চাই।
আমরা আশুরা থেকে শিক্ষা নিতে চাইনা। আশুরার একটি শিক্ষা হল ঃ জালিম সাম্রাজ্য যত শক্তিশালী হোক না কেন, যত বর্বর ও পিশাচ হোক না কেন তার পতন হবেই। যদি আমরা সত্যিকারার্থে ঈমানদার হই ও জালেম সাম্রাজ্য ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধৈর্যের সাথে অটল থাকতে পারি।
আর মুছা আ. ও তার অনুসারীরা এদিনেই তো ফেরআউনী সাম্রাজ্যেকে পরাজিত করেছিলেন আল্লাহর সাহায্যে।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ (الأعراف :١٢٨)

"মুছা তার সম্প্রদায়কে বলল , 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; এ পৃথিবীতো আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং শেষ ফলাফল তো মুত্তাকীদের পক্ষে।"
(সূরা আরাফ : ১২৯)

যে কারণেই আমরা ইহুদী, খৃষ্টানদের অনুসরণ করি বা তোষামোদ করি না কেন আমরা যে হীনমন্য, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য যে আমাদের নেই এটাই অন্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যদি বিষয়টি উদারতা ও সহশীলতার বিষয় হয় তাহলে তা একতরফা হবে কেন? 'শুধু আমাদের মুসলিমদের সহনশীল ও উদার হতে হবে অন্যদের সহনশীল ও উদার হওয়ার দরকার নেই' এ নিয়ম আমাদের কে শিখিয়েছে?

বহু খৃষ্টান ও অমুসলিম দেশ আছে যেখানে মুসলিমগন দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। আনুপাতিক হারে আমাদের দেশের অমুসলিমদের সংখ্যার তুলনায় সে সব দেশে মুসলিমদের সংখ্যা বেশী। সে সকল দেশে মুসলিমদের ঈদের দিনে সাধারণ ছুটি দেয়া হয় না। শুধু এটুকুই নয় অনেক মুসলিম দেশ আছে যেখানে খৃষ্টানদের অনুকরণে এখনও সাপ্তাহিক ছুটি পালিত হয় রবিবারে। একটু অনুসন্ধান করে দেখুন না এমন একটা অমুসলিম দেশ পাওয়া যায় কিনা যেখানে মুসলিমদের অনুকরণ করে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারে পালিত হয়? কখনো পাবেন না। তারা তো আমাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন সহনশীলতা ও উদারতা দেখায় না। আমরা কেন এত উদার? তারা আমাদের কোন ছাড় দেয় না। আমরা কেন এত ছাড় দেই? শুধু ছাড় দেয়া নয় রীতিমত তাদের প্রভু মানতেও আপত্তি করি না। আমরা এত ভীরু কেন? নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসে এত দুর্বল কেন?

এ সকল ইহুদী ও খৃষ্টান দেশগুলোর অনেকে তো আরব ও মুসলিম বিশ্বের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা বানিজ্য করে। তারা তো ব্যবসার স্বার্থে তাদের দেশে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার করার কথা কল্পনাও করে না। ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে ইহুদীদের সাথে কারো তুলনা চলে না। তারাও তো নিজেদের দেশে শনিবার ছাড়া অন্যদিন সাপ্তাহিক ছুটির কথা কল্পনা করতে পারে না। আমাদের মুসলিমরা শুধু কল্পনা নয় রীতিমত দাবী করে যে সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার করা হোক। এতে নাকি তারা ব্যবসা করে দেশকে উন্নত করে দিবে। ফলাফল দাড়ায় এ রকম যে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের বিধানমত শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি পালন

করে অর্থনৈতিক ক্ষতি বরদাশ্ত করতে রাজী কিন্তু আমরা মুসলিমরা শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার পালন করে কোন ক্ষতি বরদাশ্ত করতে প্রস্তুত নই। বরং কাফেরদের ধর্ম ও সাংস্কৃতির অনুসরণ করে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখি।

সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারে হতে হবে এমন নির্দেশ ইসলামে নেই ঠিক। কিন্তু ইসলামের কথা হল ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনকে মুসলিমরা ছুটির দিন হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনা।

ইসলাম হল মধ্য পন্থার ধর্ম। তার দৃষ্টিভংগি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিবদ্ধ। তাই অমুসলিমরা ভাল কিছু করলে শুধু বিরোধীতার খাতিরে তার বিরোধীতা করতে হবে এমন শিক্ষা কিন্তু ইসলাম দেয় না।

কথা ছিল আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের ছাড়িয়ে যাবো। যেমন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي في كتاب العلم وقال هذا حديث غريب

“জ্ঞান-বিজ্ঞান হল মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ। তাই যেখানেই তা পাবে সেখান থেকেই তা লুফে নেয়ার অধিকার থাকবে অন্যের চেয়ে তার বেশী।”
বর্ণনায়ঃ তিরমিজী

কিন্তু আমরা কি তা পেরেছি? আমরা অবশ্য তাদের থেকে কিছু শিখেছি। যা শিখেছি তা আমাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যায় না, অবনতির দিকে নিয়ে যায়। তাদের থেকে আমরা পার্টি দেয়া শিখেছি। কাউকে সাহায্য করার নামে কনসার্ট করতে শিখেছি। কবরে ও প্রতিকৃতিতে পূষ্পমাল্য দিতে শিখেছি। সন্তানদের জন্ম দিবস পালন করতে শিখেছি। মৃতের সম্মানে নীরবতা পালন করতে শিখেছি। নব-বর্ষ ও থার্টি ফাষ্ট নাইট উদযাপন করতে শিখেছি। আরো শিখেছি উচ্ছৃংখল নোংড়া বিনোদন সহ অনেক কিছু। যত অনর্থক ও বেহুদা কাজ আছে সবগুলোই আমরা তাদের থেকে রপ্ত করে নিয়েছি। আর যা কিছু কল্যাণকর ও অগ্রগতির উপাদান তা আমরা রপ্ত করতে পারিনি। না পারার ব্যর্থতার দায়ভার অনেকে ধর্মীয় নেতাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যা সম্পূর্ন অযৌক্তিক। কেননা বহু যুগ থেকেই মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা নেই ও কোন ভূমিকা নিতে দেয়া হচ্ছেনা। যখন তাদের ভূমিকা ছিল তখন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এমন ছিল না।

আমরা মুসলিমরা তাদের থেকে শিখতে পারিনি কিভাবে মহাকাশে গ্রহ থেকে গ্রহান্ত রে ঘুরে বেড়াতে হয়। শিখতে পারিনি কিভাবে নিজ দেশ ও স্বজাতির জন্য দায়িত্ব পালনে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হতে হয়। শিখতে পারিনি কিভাবে নিজ দেশ ও

জাতির জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। শিখতে পারিনি নিজ ধর্মের অনুসারী মানুষের স্বার্থে কিভাবে সোচ্চার ও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হয়। পারস্পরিক লেনদেন আচার-আচারণে কিভাবে সততার পরিচয় দিতে হয়। দেশের স্বার্থে কিভাবে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রিয়তা পরিহার করে চলতে হয়।

আমরা কি নিজেদের একটা প্রশ্ন করতে পারি না যে, আমরা কেন ওদের থেকে এমন আচার-আচরণ অনুকরণ করব যা একবারে অনর্থক। সকল অনর্থক কাজ পরিহার ও অর্থবহ কাজ করার জন্য কি আমাদের ধর্ম নির্দেশ দেয়নি? কেন তাদের ভাল কাজগুলোকে বাদ দিয়ে তাদের অনর্থক কাজগুলোকে আমরা অনুসরণ করে যাচ্ছি? কেহ আমাদের এতে বাধা দিতে গেলে আমরা তাদের বিভিন্ন ভাষায় গালি-গালাজ করি। আর নিজেদের খুব প্রগতিশীল ভাবি।

আমাদের অবস্থা যেন তাদের মত হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (الأعراف : ١٤٦)

“তারা সৎপথ দেখলে উহাকে অনুসরণীয় পথ বলে গ্রহণ করে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা অনুসরণীয় পথ হিসেবে গ্রহণ করে।”

সূরা আরাফ : ১৪৬

আচ্ছা ওরা কি আমাদের কোন ভাল আচার-আচরণ গ্রহণ করে? না আমাদের ধর্মে ভাল বলতে কিছুই নেই। তাদের আনুগত্য ও অনুকরণ করার এ পরাজিত মানসিকতা কখনো আমাদের সামনের দিকে নিয়ে যাবে না। বরং আমাদের পিছনেই নিয়ে যাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ (آل عمران : ١٤٩)

“হে মু’মিনগন! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।”

সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৯

রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারবার এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করেছেন। মুসলিমগণ যে ইহুদী খৃষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ করা শুরু করবে তা তিনি ভবিষ্যতবানী করে গেছেন।

যেমন হাদীসে এসেছে

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى؟ قال : فمن ؟ رواه البخاري و مسلم

আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহের আচার-আচরণ সর্বোতভাবে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন হে রসূল! পূর্ববর্তী জাতি বলতে কি ইহুদী খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে? রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ "তারা ছাড়া আর কারা?" বর্ণনায় ঃ বুখারী ও মুসলিম

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যতবানী করেছেন। উদ্দেশ্য হল আমাদের সতর্ক করা। তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করা। তার ভবিষ্যতবানী বাস্তবায়ন করা নয়। কিন্তু আজ আমরা সতর্কতা অবলম্বন না করে সর্বক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করছি। তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করার মত কোন অনর্থক কাজ করে আমরাও তা করে যাচ্ছি। আর ভাবছি এমনি করে আমরা উন্নত হবো।

পরিতাপের বিষয় আজ মুসলিমদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদী ও খৃষ্টানদের পদে পদে অন্ধের মত অনুসরণ করেই তৃপ্তি লাভ করছে না বরং এ ক্ষেত্রে তারা মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে আরম্ভ করেছে। তাদের অন্ধ ভক্তের মত আচরণ করতেও পিছপা হচ্ছেনা।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ; মনে করুন আমেরিকার খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট একটি ইসলামী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বললেন যে , "আমরা ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে সন্ত্রাসী কাজে মদদ দাতা বলে সন্দেহ করি।" তিনি হয়ত কথাটি ৫০% ভাগ বিশ্বাস নিয়ে বলেছেন। তার এ কথাটি আমেরিকার খৃষ্টান জনগন ৪০% ভাগ সত্য মনে করে গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমাদের মুসলিম দেশের বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদসহ সুশীল সমাজের একটি অংশ মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ কথাটিকে ১০০% ভাগ বিশ্বাস করে নিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠানটিকে 'সন্দেহ ভাজন সন্ত্রাসীর মদদদাতা' বলে আখ্যায়িত করলেন। কিন্তু সেই মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা প্রতিষ্ঠানটিকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী, চরমপন্থী, তালেবান, আল-কায়েদা সহ অনেক গুলো বিশেষনে ভুষিত করলেন। সর্বদা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে থাকলেন।

সম্মানিত পাঠক!
এটা শুধু একটা কাল্পনিক উদাহরণ নয়। বাস্তবে এর অসংখ দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনেই রয়েছে। আমাদের সংবাদ-মাধ্যমগুলোর ভূমিকার প্রতি লক্ষ করে দেখুন না! ইহুদী খৃষ্টানদের উচ্ছিষ্ট ভোগের আশায় ও তাদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার জন্য তারা জেনে বুঝেই এমন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। ইহুদী খৃষ্টানদের প্রতি কত গভীর বন্ধুত্ব, আনুগত্য ও দাসত্ব থাকলে এটা সম্ভব, তা একটু ভেবে দেখতে পারেন।
তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেই বাণী স্মরণ করতে হয়

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ (سورة النساء : ١٣٩)

"মুমিনদের পরিবর্তে যারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট সম্মান চায়? সমস্ত ইয্যত-সম্মান তো আল্লাহরই।" সূরা নিসা ঃ **১৩৯**

নৈকট্য অর্জন ও মহব্বতের সত্যিকার পরিচয়

ইহুদীরা আশুরায় তাদের রোযা রাখার কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছে যে, নবী মুছা আ. এ দিনে ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এ নাজাতের শুকরিয়া আদায় করতে যেয়ে তিনি সওম পালন করেছেন।
এখানে দুটো বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে।
প্রথম বিষয় হল ঃ আশুরাতে তাদের রোযা রাখাটা মুছা আ. এর আনুগত্য ও নৈকট্যের প্রমাণ বহন করে কিনা।
দ্বিতীয় বিষয় হলঃ সত্যিকারভাবে তাদের এ পর্ব দশই মুহাররম অনুষ্ঠিত হয় কিনা।
প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে কথা হলঃ ইহুদীরা মুছা আ. এর ঘনিষ্ঠতর এটা প্রমাণের জন্য আশুরার রোযা যথেষ্ঠ নয়। তারা নিজেদের মুছা আ. এর অনুসারী বলে দাবী করে এবং তারা বংশের দিকে দিয়ে মুছা আ. এর বংশধর। যেমন তারা দাবী করে তারাই শুধু ইবরাহীম আ. এর সন্তান ও তার অনুসারী। এবং ইবরাহীম আ. ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন।
তাদের এ দাবী নাকচ করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ آل عمران : ٦٧

“ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।”

সূরা আলে ইমরান: ৬৭

ইহুদীরা দাবী করে তারা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে। তেমনি খৃষ্টানরা দাবী করে তারাই মুলত ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী। মক্কার মুশরিকরাও এ দাবী থেকে পিছনে ছিল না। আল্লাহ তাআ'লা তাদের সকলের এ দাবী অসার বলে ঘোষণা দিলেন। ইবরাহীম তাওহীদের এক মহান আদর্শের নাম। ইবরাহীমের বংশে জন্ম নিলেই এ আদর্শের অনুসারী বলে দাবী করা যায় না। নবীদের উত্তরাধিকার বংশের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় না। তাদের আনীত তাওহীদ ও রেসালাতের নির্ভেজাল আনুগত্যের মাধ্যমেই তাদের যথার্থ উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে মুসলিমরাই ইবরাহীম, মুছা, ও ইছা আ. এর নিকটতম ও খাটি অনুসারী ও তাদের মহব্বতের যথার্থ দাবীদার।

তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

آل عمران : ٦٨

“নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে ; আর আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।”

সূরা আলে ইমরান: ৬৮

তাই ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইবরাহীমের বংশের হলেও তার ঘনিষ্ঠ হওয়া ও মহব্বতের দাবী তারা করতে পারে না। কারণ তারা ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করে না। বরং তারা বিভিন্ন রকম শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে নবীদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তাদের নবীদের রেখে যাওয়া ধর্মকে বিকৃত করেছে।

তাই বলা যায় আখেরী নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যথার্থ অনুসারীগণই মূছা আ. এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও সম্পর্কের দাবীদার। বংশ, স্থান ও কালের দূরত্ব থাকা সত্বেও আদর্শের ভিত্তিতে এক এবং হৃদয়ের দিক দিয়ে আপন হওয়া যায়। তাই তো দেখা যায় বিশ্বের যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, যে যুগেরই হোক না কেন, যে ভাষার হোক না কেন ও যে বংশের হোক না কেন, সকল মুসলিম একই দলভূক্ত,একই উম্মাহ ; একটাই জাতি। বংশ পরম্পরার দূরত্ব, স্থান ও কালের বিচ্ছিন্নতা, ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা এ ক্ষেত্রে কোন বাধা হতে পারে না। যার মধ্যে যত বেশী ঈমান থাকবে আল্লাহ ও তার নবীদের কাছে সে তত বেশী প্রিয় ও নিকটতম হবে।

নবী ও রসূলদের আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত শুধু মহব্বতের দাবী সত্যি হতে পারে না। আর এ ধরণের মহব্বত কোন কাজেই আসবে না।

আবু লাহাব মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসত। এতই ভালবাসত যে তার জন্ম গ্রহণের সু সংবাদ যে কৃতদাসীর কাছে শুনল আনন্দের অতিশয্যে সে কৃতদাসী সুয়াইবাকে মুক্ত করে দিল এবং নবুওয়ত পূর্ব পুরো চল্লিশ বছর মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আবু লাহাবের এ স্নেহ মমতা ছিল অক্ষত। কিন্তু এ ভালবাসা ও মুহব্বতে কোন লাভ হয়নি। মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ অস্বীকার করার ফলে আবু লাহাবের চেহারা পাল্টে গিয়েছিল।

কেহ বলতে পারেন যে আবু লাহাব শেষ জীবনে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুশমনে পরিণত হয়েছিল বলে তার মুহাব্বত বৃথা গেছে।

আমি বলব তাহলে আবু তালিবের দিকে তাকান। তার কথা কারো অজানা নয়। মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একেবারে শৈশব থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে নিজ সন্তানের মত ভালবেসে লালন পালন করেছেন। আর এ ভালবাসতে গিয়ে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দীর্ঘ তিন বছর খেয়ে না খেয়ে উপোষ থেকে এক গিরি উপত্যকায় মক্কাবাসী কর্তৃক আরোপিত বয়কট সহ্য করে মুহাম্মদের ভালবাসার মাশুল দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছায়ার মত সাথে থেকেছেন। তার অনুসরণ করা দরকার এটা স্বীকারও করেছেন। তার উদ্দেশ্যে কবিতা ও রচনা করেছেন। কিন্তু অনুসরণ করলেন না তার আনীত পয়গামের। ফলে সবকিছু বৃথা হয়ে গেল। তার জন্য প্রার্থনা করতেও নিষেধ করা হল।

পশ্চিমা অনেক লেখক ও গবেষকরা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রূপে স্বীকার করেন। কিন্তু সকল মানবের জন্য তার অনুসরণ যে অপরিহার্য এ বিষয়টি তাদের বুঝে আসেনি।

গ্যেটে কারলাইল থেকে শুরু করে এ যুগের ‘দি হানড্রেড ’লেখক মাইকেল হার্ট পর্যন্ত বহু লেখক ও গবেষক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে অনেক প্রসংশাসূচক উক্তি ও গুণগান করেছেন। সীমাহীন ভক্তির নৈবদ্য পেশ করেছেন। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন যে, আবহমান পৃথিবীর সর্বকালীন প্রেক্ষাপটে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই এক নাম্বার ব্যক্তি। কিন্তু তাদের এ ভালবাসা ও প্রসংশা তাদের কোন উপকারে আসেনি। কারণ তারা তার আনীত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণের কোন চেষ্টা করেনি।

আজ যারা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আহলে বাইতের মহব্বত ও ভালবাসার নামে কান্নাকাটি করেন,তাযিয়া করেন, মীলাদ পড়েন আরো অনেক কিছু করেন যা তিনি করতে বলেননি। তাঁর মহব্বতে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাঁর আদেশ পর্যন্ত লংঘন করেন। বিভিন্ন বিদ'আতী কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না। তারা এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। সামনে রাখতে পারেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেই বানীঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ . النساء : ٦٤

"রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে।"

সূরা আন-নিসাঃ ৬৪

তার আনুগত্য না করে বিভিন্ন বিদআ'তী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে তাঁর মহব্বতের দাবী করা একটা ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। মহব্বতের পরিচয় প্রকাশ পাবে শুধু আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ آل عمران : ٣١

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

সূরা আলে ইমরান: ৩১

তাই যে যত বেশী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে ততবেশী মহব্বত ও ভালবাসার দাবী করতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে কথা হলঃ অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ বর্তমানের ইহুদীরা আশুরা ইত্যাদি পর্ব সৌর সন অনুযায়ী করে থাকে। আর মুহাররম মাস হল চন্দ্রমাস। এতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে ইহুদীরা আশুরা নির্ধারণের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে কিনা। আসলে পারেনি। এ ক্ষেত্রেও তারা পথ হারিয়েছে। আর মুসলিমগন চন্দ্রমাস অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করেন তাই তারা আশুরা নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

যেমনি ভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানরা সাপ্তাহিক দিন নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছে।

সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গ

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা অপ্রাষঙ্গিক হবে বলে মনে করি না। তা হল: আজকাল মুসলিম উম্মাহর অনেক বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও পন্ডিত সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ ও কুরবানী সহ সকল ইসলামী পর্ব অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মতামত দিয়ে আসছেন। অনেকে এ দেশে বসে সৌদী আরবের সাথে রমজান, ঈদ, কুরবানী পালন করে থাকেন। তাদের খেদমতে আমরা সবিনয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা পেশ করতে পারি।

এক. আল-কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে "লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল সেটা মানুষ ও হজ্বের জন্য সময় নির্দেশক।"

এবং সূরা ইউনূসের পঞ্চম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে "এবং তিনি চাঁদের জন্য মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা সন গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার।"

এ দু আয়াত দ্বারা বুঝে আসে বিশেষ করে ধর্মীয় পর্বাদিতে চন্দ্র মাস হিসেব করে, সে অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি পালন করা হল সঠিক কাজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটাই চান।

দুই. দেশ ও ভৌগলিক অবস্থানের বিভিন্নতার কারণে চন্দ্রের উদয়স্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট স্থানের অধিবাসীরা এ বিভিন্নতা মেনে নিয়ে তাদের স্থানীয় সময় অনুযায়ী ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। এটা যেমন যুক্তিগ্রাহ্য, তেমনি বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তিন. সৌরসন অনুযায়ী ধর্মীয় উৎসবাদি পালন করা মুশরিক ও মুশরিকদের দ্বারা প্রভাবিত ইহুদী খৃষ্টানদের রীতি। মুসলিমদের রীতি হল সম্পূর্ণ সতন্ত্র। তারা প্রত্যাহিক ইবাদত বন্দেগী সৌর সময় অনুযায়ী করে থাকেন স্থানীয় সময় অনুসরণ করে। আর মাসিক ও বার্ষিক পর্বগুলো চন্দ্র মাস হিসেবে পালন করেন। বলা যায় এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) হয়ে গেছে।

চার. একই দিনে ঈদ ও কুরবানী সহ অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবাদি পালন করতে চাওয়ার মনোভাব যদি এ কারণে হয় যে, ইহুদী, কৃশ্চিয়ান ও অন্যান্য ধর্মানুসারীরা একই দিনে সারা বিশ্বে তাদের উৎসবাদি পালন করে থাকে আমাদেরও সে রকম করা উচিত, তাহলে ব্যাপারটি হবে খূবই দুঃখ জনক। তবে কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই বলা যায়, আমাদের শ্রদ্ধেয় ইসলামী চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্য এটা নয় মোটেই।

পাঁচ. সৌরসন হিসেবে দিন গণনার ব্যাপারে আমরা যখন ভৌগলিক ভিন্নতা স্বীকার করে নিয়ে সে অনুযায়ী সালাত আদায় করে থাকি; যখন সৌদী আরবে ফজরের

সালাত পড়া হয় আমরা তখন ফজর পড়ি না, যখন সেখানে জোহর আদায় করা হয় আমরা তখন তা আদায় করি না। এভাবে যখন সেখানে ঈদ পালন করা হবে আমরা তখন পালন করব না। এটা যেমন যুক্তি সংগত, তেমনি বাস্তব। যখন আমরা সূর্যের উদয়-অস্তের তারতম্য মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করি তাহলে চন্দ্র মাসের বিভিন্নতা মেনে নিয়ে আমল করলে অযৌক্তিক হবে কেন? যখন এ ব্যাপারে চন্দ্র মাসই হল ইসলামী অনুষ্ঠানাদির অনুসরণযোগ্য ও মুল তারিখ।

ছয়. ইসলাম সকল যুগের মানুষের জন্য যেমন মান্য করা সহজ। তেমনি তার পর্বগুলোর হিসেব রাখা সকলের আয়ত্বের মধ্যে থাকবে। এটা যেমন সে যুগের জন্য প্রযোজ্য, যে যুগে এক শহরের খবর অন্য শহরে পৌছতে কয়েকদিন লেগে যেত। তেমনি এ যুগের জন্যও প্রযোজ্য, যে যুগে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির কারণে এক প্রত্যন্ত গ্রামের খবর এক মুহুর্তের মধ্যে সাড়া বিশ্বে পৌছে যায়। সর্বাধুনিক সুবিধার অধিকারী এক শহরবাসী যেমন ইসলামী পর্ব সম্পর্কে জানতে পারে তেমনি বিজন দ্বীপে কিংবা গভীর সমুদ্রে বা নির্জন জঙ্গলে অবস্থানরত একজন মানুষ যেন ইসলামী পর্বের হিসেব নিজেই রাখতে পারে সে ব্যবস্থা ইসলামের মত সার্বজনীন ও শাশ্বত ধর্মই করেছে। আর তা হল চন্দ্র দেখে মাস ও বছরের পর্বগুলোর হিসাব করতে সক্ষম হওয়া।

সাত. লক্ষ করা যাচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে একটি মারাত্মক বিতর্ক ও হানাহানির পরিবেশ তৈরী হতে যাচ্ছে। অনেক স্থানে একদিন বা দুদিন আগে ঈদ পালন করার ফলে ইসলামী ঈদের বাণী সংহতি, সম্প্রতির ও সৌহার্দের পরিবর্তে ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারির পরিবেশ তৈরী করছে। সাড়াবিশ্বে একটি প্রতীকী সংহতি সৃষ্টির উদ্দেশে একটি সত্যিকার বিভেদ-বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে সাড়াবিশ্বে একই দিনে ঈদ উদযাপন করার প্রস্তাবের পক্ষে কখনো ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় বিষয়টি সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহর কাছে সমর্পন করা নিরাপদ। তাই সহীহ হাদীস মোতাবেক চন্দ্রের উদয়-অস্তের ভিন্নতা মেনে নিয়ে স্থানীয় তারিখ অনুযায়ী ইসলামী পর্বাদি পালন অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। একই দিনে রমজান, ঈদ পালন করা মানে ইসলামী পর্ব পালনে পরোক্ষভাবে সৌরবছর অনুসরণ করা। অর্থাত সৌদী আরবে যে দিনে ঈদ পালিত হবে আমরা সে দিনে ঈদ পালন করবো কিসের ভিত্তিতে? অবশ্যই সৌর হিসেবের ভিত্তিতে। সৌর তারিখ হিসেবে সেদিন দু দেশে একদিন হয় বটে চন্দ্রের হিসেবে তো দু দেশে এক দিন নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত সবচেয়ে বড় শোকর

ফেরআউনের কবল থেকে মুছা আ. ও তার জাতির মুক্তি ছিল আল্লাহ তাআ'লার এক বড় নেয়ামত।

এ মুক্তির পর তিনি সওম পালন করে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা নেক আমল হল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের বড় মাধ্যম।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ . سورة سبأ : ١٣

"হে দউদ পরিবার! শুকরিয়া হিসেবে তোমরা নেক আমল করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই শুকরিয়া আদায়কারী রয়েছে।"

সূরা সাবা: ১৩

শুকরিয়া আদায়ের অর্থ হল যে অনুগ্রহ করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

পাঁচটি বিষয়ের উপর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

সে গুলো হলঃ

এক. নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রতি বিনয়বনত হওয়া।

দুই. নেয়ামত দাতা আল্লাহকে মহব্বত করা।

তিন. নেয়ামতকে মনে প্রাণে গ্রহণ ও স্বীকার করা।

চার. মুখ দ্বারা নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রশংসা করা।

পাঁচ. নেয়ামতকে নেয়ামত দানকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ব্যবহার না করা বরং তাঁর সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করা।

(মাদারেজুস সালেকীন)

এর যে কোন একটি পাওয়া না গেলে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না। একটি বিষয় সতর্ক করা জরুরী মনে করছি। তা হলঃ ইবাদত সম্পূর্ন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা অনুসরণ করা ও যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করাই হল ইবাদতের মূলকথা। তাই নতুন কোন ইবাদতের পদ্ধতি প্রচলন করার কোন অবকাশ নেই কোন ভাবেই। যদি কেহ করে তা বিদআ'ত বলে গণ্য হবে। তাই আশুরার সাথে এমন কোন ইবাদত খাছ করা জায়েয নেই যা আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাছ করেননি।

আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম ইবাদতের যে সকল পদ্ধতি চালু করে গেছেন তার উপর কায়েম থাকা, সেগুলোকে ধর্মের জন্য যথেষ্ট মনে করা, তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও

বাস্তবায়ন করা হল বাস্তবিক পক্ষে শুকরিয়া আদায় করা। এ ছাড়া ধর্মে নতুন কোন পদ্ধতি চালু করা বিদআ'ত। যা প্রত্যাখ্যান করা একান্ত কর্তব্য। নবী-রাসূলদের মহব্বতে তা তাদের সম্মানার্থে এমন কিছু করা যাবে না যা তাদের দ্বারা অনুমোদিত নয়। তাদের সম্মান ও মহব্বতে নিজেদের পক্ষে কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন যদি জায়েয হত তাহলে খৃষ্টানরা যে ইছা আ. কে মহব্বত করে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, তা শিরক হতো না। আল্লাহর এক নবীকে নিজেদের মনগড়া বিদআ'তী পদ্ধতিতে সম্মান ও মহব্বত করতে যেয়ে তারা কাফের ও মুশরিকদের খাতায় নিজেদের নাম লিখিয়েছে।

মূল কথা হল ঃ ইবাদত ; আনুগত্য ও অনুসরণের নাম। দ্বীনের মধ্যে ইবাদত হিসেবে নতুন কোন পদ্ধতির প্রবর্তন কখনো ইবাদত বা নেক আমল বলে গণ্য হবে না। হয়ত তা কূফর নয়তো শিরক না হয় বিদআ'ত বলে প্রত্যাখ্যাত হবে।

আলোচনার সার কথা

- আশুরা একটি গুরত্বপূর্ণ ইসলামী পর্ব।
- আশুরাতে সওম পালন করা সুন্নাত।
- আশুরার সওম (রোযা) দুদিন পালন করা উচিত। মুহাররম মাসের নবম ও দশম তারিখে। যদি নবম তারিখে সওম পালন সম্ভব না হয় তবে দশম ও একাদশ তারিখে সওম পালন করবে। মনে রাখতে হবে নবম ও দশম তারিখে দুটো সওম পালন করা উত্তম।
- আশুরার জন্য শরীয়ত অনুমোদিত বিশেষ আমল হল এই সওম পালন। এ ছাড়া আশুরার অন্য কোন আমল নেই।
- কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে আশুরার কোন সম্পর্ক নেই। আশুরার মর্যাদা বৃদ্ধিতে বা কমাতে এর কোন ভূমিকা নেই।
- কারবালার ইতিহাস স্মরণে আশুরা পালনের নামে যে সকল মাতম, মর্সিয়া,তাযিয়া মিছিল, শরীর রক্তাক্ত করাসহ যা কিছু করা হয় এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম এ সকল কার্যকলাপের অনুমোদন দেয় না। এগুলো সন্দেহাতীত ভাবে বিদআত। এগুলো পরিহার করে চলা ও অন্যদের পরিহার করতে উৎসাহিত করা রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ অনুসারী সকল ঈমানদারের কর্তব্য।